অসমের লোককথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বেস্টবুকস্
১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

প্রচ্ছদ : শ্রীসৌমেন মুখার্জী

প্রকাশক :

বেস্টবুক্‌স্‌

১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :

কালাচাঁদ ঘোষ

বাণী আর্ট প্রেস

১১, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া

মিণ্টু-কে

লেখকের অন্যান্য বই—

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গল্প

কোষ থেকে মানুষ

সবুজবাড়ি ও পরিবেশের গল্প

টাট্টু থেকে ইনস্যাট

অমৃতস্য পুত্রাঃ

ও

আরো অনেক

গোড়ার কথা

জীবনের দুঃখ বেদনা, বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা এমন কী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপও আশ্চর্য সারল্যে লোককাহিনীর মধ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তার মধ্য দিয়ে জাতি বা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ভাবনা, জীবনবোধ এবং আচার অনুষ্ঠানের রূপটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে, লোক-কাহিনী শুধুই গল্প নয়, জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবিও।

বিভিন্ন প্রদেশের লোককাহিনীর অন্তরঙ্গ সুরটি কিন্তু একই ধারায় বেজে চলেছে। তাই সেগুলি জানার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক সংহতি-বোধও জেগে ওঠে মনে। ভারত আমার দেশ, প্রতিটি ভারতবাসী আমার ভাই বা বোন, এমন চিন্তা সহজেই দানা বাঁধে লোককাহিনী পড়তে পড়তে। এ কারণেই এই সঙ্কলন।

একই ভৌগোলিক পরিবেশ ও সংস্কারের মধ্যে লোকায়ত জীবন বিকশিত হয়ে ওঠার মধ্যেই বাংলা ও অসমের লোককাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শুধু বাংলা নয়, সব দেশের লোককাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায় এ ধরণের সাদৃশ্য।

এই সঙ্কলনটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর 'টেলস অব অসম' থেকে। তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন রাজ্যের লোককাহিনী প্রকাশের সাধু উদ্যোগ নিয়ে শ্রীবিন্দু ভট্টাচার্য এই

বইটিও প্রকাশ করছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, সব শ্রেণীর মানুষ তাঁকে জানাবেন অভিনন্দন। সেই সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই, সোমনাথ নন্দীকে, যার উদ্যোগ ছাড়া হয়তো কোনদিনই লেখা হত না এ বই। আর সবশেষে, যাদের জন্য এ বই লেখা তাদের যদি ভালো লাগে তবেই সার্থক হবে এই গল্পগুলি ফিরে বলা।

অলমিতি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

মার চেয়ে বড় নেই

গাঁয়ের নামটি কেউ জানে না।

সেই বুড়ির নামটিও কেউ জানে না।

এমন কি কোন্ কালে যে ঘটেছিল ঘটনাটা তাও কেউ জানে না। তবু ঘটনাটা সবাই জানে। সবাই জানে, মা বড় ধন, মার চেয়ে আপনার আর নেই কেউ।

তাহলে গোড়া থেকেই বলি! নাম না জানা গাঁয়ের সেই যে নাম না জানা বুড়ি, তার আপনার বলতে কেউ ছিল না এক ছেলে আর তার বউ ছাড়া।

বুড়ি তার ছেলেকে ভালবাসত দারুণ। ছেলেও তেমনি ভালবাসত তার মা-কে। ছেলের বউয়ের কিন্তু এসব ভাল লাগত না। তার সব সময়ই মনে হত বুড়ি মরে না কেন, তাহলে বেশ সুখে থাকত তারা।

বুড়ি কিন্তু ছিল ভারি সহজ সরল মানুষ। বৌয়ের হেলাফেলা তাই সে চোখ মেলেও দেখত না। ছেলে তাকে ভালবাসে এই সুখেই কাটত তার দিন।

বুড়ির একদিন হঠাৎ-ই ইচ্ছে হল রুই মাছের মুড়ো খাওয়ার। প্রথমে সে চেষ্টা করল তার ওই ইচ্ছেটাকে মেরে ফেলার। কিন্তু সে যত চেষ্টা করে ততই ইচ্ছেটা যেন উনুনে বসানো দুধের মত উথলে

উথলে উঠতে থাকে। বুড়ি কিছুতেই পারে না ইচ্ছেটাকে ঠেকাতে।

একদিন শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলের বৌ-কে বলে বুড়ি, বৌমা, একটি কথা বলি, কিছু মনে কোরো না যেন।

ওই মনে কোরো না কথাটা শুনেই মুখটা একটু ব্যাজার হয় বৌয়ের। ঠাণ্ডা মাথায় বলে, কি বলবেন বলুন?

দেখ মা, কদিন ধরেই আমার রুই মাছের মুড়ো খাওয়ার দারুণ সাধ হয়েছে। তা তুমি মা একদিন আমাকে রুইয়ের মুড়োটা দিও কেমন!

বুড়ির ইচ্ছের কথা শুনে বৌয়ের পিত্তি যেন জ্বলে ওঠে। কিন্তু মুখে কিছু না বলে চলে যায় সে। বুড়ি ভাবে, সেদিনই খাবার পাতে পাবে সে মুড়ো।

বৌ কিন্তু বুড়িকে মুড়ো দেয় না। হয় সে নিজে খায়, কিংবা দেয় তার স্বামীকে। ওদিকে রোজই খেতে বসে বুড়ি মাছের বাটিতে আঙুল ডোবায়। শুধু জল, শুধু জল। মুড়ো দূরে থাক মাছের টুকরোও খুঁজে বের করতে হয়। বুড়ি কিন্তু হাসি মুখেই বলে, বৌমা, ভুলে গেছ বুঝি।

বৌটিও ঠাণ্ডা মাথায় বলে, সত্যিই ভুলে গেছি মা। বুড়ি আর কিছু বলে না। চুপচাপ খেয়ে নেয়। ভাবে পরদিন নিশ্চয় সে পাবে মাছের মুড়ো।

পরদিনও সেই একই ব্যাপার। তার পরদিন—তার পরদিন—রোজই সেই একই কথা, বৌমা, ভুলে গেছ বুঝি?

হ্যাঁ মা, একদম ভুলে গেছি।

সেদিন ঘরে ছিল ছেলে। মা আর বৌয়ের কথাটা শোনে সে।

কিন্তু বুঝতে পারে না কথার অর্থ। তাই মাকে জিজ্ঞেস করে। কি হয়েছে মা, কিসের কথা বলছ।

ছেলেকে বুড়ি কোনরকম কষ্ট দিতে চায় না। সব শুনে পাছে ছেলে মনে ব্যাথা পায়, তাই বুড়ি তাড়াতাড়ি বলে। ও কিছু নয়, ও কিছু নয় বাবা।

ছেলের কৌতূহল কিন্তু তাতে মেটে না। বরং সাপের মত কিলবিলিয়ে ওঠে তা। তাই বৌকে সে জিজ্ঞেস করে, মা কিসের কথা বলছিল ?

বৌ চারিদিক চেয়ে দেখে ফিসফিসিয়ে বলে, সে লজ্জার কথা আর কি বলব ভাবলেই ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মাগো মা কি লজ্জা।

বৌয়ের ভনিতা দেখে চটে যায় ছেলে। বেশ ধমকেই বলে, কি হয়েছে বলবে তো ?

বৌ আবার ফিসফিসিয়ে বলে, তোমার মা আবার বিয়ে করতে চায়। তাই বলছিল।

কী, কী করতে চায় ?

বিয়ে, বিয়ে গো।

কথাটা শুনে ছেলে তো থ। সারা গাটা তার রি-রি করতে থাকে রাগে। মুখে শুধু বলে, করাচ্ছি বিয়ে।

পরদিন সকালে উঠেই ছেলে বলে মাকে, মা আমার সঙ্গে চল, তোমার যা ইচ্ছে সব মিটিয়ে দেব আমি।

বুড়ি তো সহজ সরল মানুষ। কিছু না বুঝেই সে বলে, চল বাবা, কোথায় যেতে হবে।

ছেলে বলে এসো আমার সঙ্গে।

মা আর ছেলে। দুজনে নেমে পড়ে পথে। ছেলে হাঁটে হনহনিয়ে। বুড়ি মা তাল রাখতে পারে না তার সঙ্গে—তবু প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে।

কষ্টে ঘাম ঝরে সারা অঙ্গ থেকে। বুড়ির কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে শুধু বলে ছেলেকে, দেখিস হোঁচট খাস না যেন।

পথ এক সময় শেষ হয় জঙ্গলে। ছেলে ঢুকতে থাকে বনে। বুড়িও। অনেক গভীরে ঢোকে তারা। তারপর বলা কওয়া নেই, বুড়িকে সেই বনে ছেড়ে দিয়ে ছেলে উধাও।

উধাও নয় লুকিয়ে পড়ল। বুড়িকে ছেড়েছে যে গাছের তলায় তারই আড়ালে লুকিয়ে পড়ে ছেলে। ইচ্ছে, কি করে মা তাই দেখবে।

ওদিকে আকাশে তখন মেঘ করেছে। ঘন কালো মেঘ। গুরুগুরু করে ডাকছে মেঘ। বৃষ্টিও নামে ঝমঝমিয়ে। কানে তালা লাগিয়ে পড়ছে বাজ।

বৃষ্টিতে সেই গাছের তলাতেও বুড়ি ভিজছে, ছেলে ভিজছে। নিজে যে ভিজছে সেদিকে বুড়ির খেয়াল নেই কোনো। সে শুধু ডেকে যাচ্ছে ভগবানকে, হেই ভগবান, বৃষ্টিটা একটু থামাও। আমার ছেলেটা যে রয়েছে পথে—সে ভিজে যাবে যে। হেই মেঘ, অমন করে ডাকে না, বাজ তুমি এখন পড় না। বাছা আমার ঘরে যাক, বসুক একটু সুস্থির হয়ে—তারপর বৃষ্টি তুমি ঝমঝমিয়ে পড়, বাজ তুমি যত খুশি পড়, মেঘ তুমি যত খুশি ডেক।

গাছের আড়াল থেকে ছেলে শুনেই যায় মা'র কথা। যত শোনে চোখে জল আসে। তবু চুপ করেই থাকে সে।

বুড়ি বলে যায়, চেয়েছিলুম রুইয়ের মুড়ো খেতে। তাই ছেলেকে আমার আসতে হল এই বনবাদাড়ে। এখন ঝড়জলে ভিজলে বাছার আমার শরীর খারাপ হবে যে। হেই বৃষ্টি, হেই মেঘ, হেই বজ্র দেবতা, —একটু খ্যামা দাও। বাছা আমার পৌঁছোক ঘরে—সেই ইস্তক থামো তোমরা।

ছেলে আর আড়ালে থাকতে পারে না। বেরিয়ে আসে সে। মাকে বলে, মা, সত্যি করে বল তো ব্যাপারখানা কি? মাছের মুড়ো —এই জঙ্গল—সত্যি করে বল কি হয়েছে?

মা এবার চোখের জলে বলে, লজ্জার কথা কি বলব বাছা। বুড়ি হয়েছি, তাই বুঝি নোলা বেড়েছে। ক'দিন ধরে বড় মাছের মুড়ো খাওয়ার সাধ হয়েছিল, তা বলেছিলুম বৌমাকে। রোজই খেতে বসে তাই বলতুম, ভুলে গেছ বুঝি?

ছেলে এবার বোঝে সব। বোঝে সবই তার বৌয়ের শয়তানি। মাকে নিয়ে ঘরে ফেরে সে। তারপর বৌ কে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় সে।

নাম না জানা গাঁয়ের সেই শয়তান বৌটি কাঁদতে কাঁদতে নামে পথে।

স্বর্গে যায় মর্ত্যে আসে টিমটিম

স্তষ্টির সেই আদ্দিকালের কথা। তখন না ছিল এই পৃথিবী না মাটি, না গাছপালা। ছিল না কোনো মানুষ কিংবা জন্তু জানোয়ারও। পৃথিবী বলতে তখন ছিল শুধু জল আর জল।

জলে ভাসা কিংবা জলে মোড়া এই পৃথিবীর অনেক—অনেক ওপরে স্বর্গে তখন বাস করছেন দেবতা। তা একদিন দেবতার মনে হল তাইতো, ওই জলে ভাসা পৃথিবীর কোথাও কি জমেনি এতটুকু মাটি, যেখানে শুরু হতে পারে স্তষ্টি।

দেবতা মাটির তত্ত্বতল্লাস করার জন্য তাই পাঠালেন ময়ুর আর টিমটিমকে (দোয়েল পাখি)। ময়ুর আর দোয়েল উড়তে উড়তে নেমে এল নিচে। তারপর তারা জলের ওপর চক্কর মারতে থাকে।

চক্কর মারতে মারতে একসময় এক জায়গায় তারা দেখে জলের মধ্যে মাথা উঁচু করে জেগে উঠেছে একটু স্থল। ময়ুর তো মাটি দেখে নেমে পড়ে সেখানে। সোনালি নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে থাকে খাবার। সত্যি কথা বলতে কি, সভ্য জেগে ওঠা ওই পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে পড়ল ময়ুর—ভুলে গেল স্বর্গের কথা।

টিমটিম কিন্তু ভোলেনি কী কাজের জন্য তার আসা। তাই মাটিতে না নেমে, ময়ুরকে সেখানে রেখেই টিমটিম ফিরে যায় স্বর্গে। দেবতাকে বলে পৃথিবীতে জলের মধ্যে জেগেছে মাটি।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নেচে ওঠে দেবতার মন। পৃথিবীতে নেমে এলেন তিনি। শুরু করেন তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টির সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে যায় ময়ূরের কথা। ময়ূর ছিল তাঁর বড় প্রিয়। বড় বাধ্য। পৃথিবীর মায়ায় সে ভুলেছে স্বর্গকে—তাই একটু দুঃখু যে হল না তাঁর তাও নয়। কিন্তু পৃথিবীতে যখনই দেখা হল ময়ূরের সঙ্গে তখনই অনুতাপে কেঁদে পড়ল ময়ূর দেবতার পায়। ময়ূরের কান্না দেখে দেবতা ক্ষমা করলেন তাঁর প্রিয় ময়ূরকে। তাকে ভালবাসতেন বলেই সেদিন থেকে তিনি তাঁর মুকুটে গুঁজে রাখলেন তার পালক।

টিমটিম কিন্তু তার কাজের জন্য পেল আরও বড় পুরস্কার। আসলে সে যে তার কাজের কথা ভোলেনি, ময়ূরের মতো পৃথিবীর মাটিতে খাবারের খোঁজ করেনি, তার জন্য খুশি হয়ে দেবতা দিলেন বর, স্বর্গ আর পৃথিবীর মধ্যে সে করতে পারবে যাতায়াত যখন খুশি তার। কোথাও সে পাবে না এতটুকু বাধা।

বর পেয়ে টিমটিম দারুণ খুশি। গরমের সময় তিনটি মাস সে থাকে স্বর্গে। সেখানেই ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়। তারপর বাচ্চাদের সেখানে রেখে সে চলে আসে পৃথিবীতে। শিস দিতে দিতে ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালে।

দেবতা যখন মাটির তল্লাসে ময়ূর আর টিমটিমকে পাঠান তার আগেই মাকড়সা এসে দেবতাকে জানায়, সে যেতে পারে পৃথিবীতে। খোঁজ আনতে পারে মাটির। দেবতা তখন তাকে পৃথিবীতে পাঠাননি। কিন্তু সে যে সবার আগে পৃথিবীতে যেতে চেয়েছিল তার জন্যই দেবতা হলেন খুব খুশি। খুশির চোটে একটি নয়, তিন তিনটে বর দিলেন তিনি মাকড়সাকে।

বর দিলেন তিনি, মাকড়সার মুখ দিয়ে বেরুবে সুতো—সেই সুতো দিয়ে সে বুনতে পারবে জাল।

শুধু জাল বোনা নয়, পাখনা না থাকলেও সেই জালের সুতো ধরে মাকড়সা যখন খুশি যেতে পারবে ওপরে, নামতে পারবে নিচে। এককথায় বিনি ডানাতেই সে উড়বে প্রায় পাখির মত।

ওইসঙ্গে দিলেন বর খাবারের জন্য মাকড়সাকে ছুটতে হবে না কোথাও। তার বোনা জালেতেই এসে ধরা দেবে তার খাবার।

তৃতীয় বরে দেবতা বলেন, এবার থেকে মাকড়সা ডিম পাড়বে সোনালি রুপোলি রঙের। তার রঙের জেল্লায় মাত হবে সবাই।

দেবতার তিন বরে দারুণ খুশি মাকড়সা। খুশি টিমটিম—স্বর্গে মর্ত্যে যখন তখন যাওয়া আসা করতে পারার জন্য। খুশি ময়ূরও—দেবতা যে তার পালক মাথার মুকুটে গোঁজেন। তাছাড়া আর স্বর্গে যেতে না পারলেও সেই হল পৃথিবীর প্রথম পাখি—এটাও তো কম আনন্দের নয়।

মানুষের আয়ু

সৃষ্টির কাজকর্ম তো শেষ। পৃথিবীর নতুন মাটিতে গাছপালা জন্মাতে শুরু করেছে। সেই গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ, বাঁদর, সাপ, পাখি আরো সব কত কি!

স্বর্গে বসে এইসব নতুন সৃষ্টি দেখতে দেখতে বিধাতাপুরুষের মুখে ছড়িয়ে পড়ে ভোরের রোদের মতো হাসি। মনে মনে ভাবেন তিনি, সৃষ্টির কাজ শেষ, এবার হাত ধুয়ে বসি অন্য কাজে।

হাত ধুতে গিয়েই বিধাতাপুরুষের মনে পড়ে গেল কথাটি। আরে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে তো। সৃষ্টি তো করেছি, কিন্তু ওদের আয়ু দিতেই তো ভুলে গেছি।

ব্যস, হাত ধোয়া মাথায় উঠল। বিধাতাপুরুষ আবার বসলেন তাঁর স্বপ্নের সেই পিঁড়িটিতে—যেটায় বসে এতক্ষণ তিনি করছিলেন নানা সৃষ্টি। পিঁড়িতে বসেই হাঁক মারেন তিনি তাঁর নতুন সৃষ্টিদের, ওহে তোমরা সব এসো। তোমাদের আয়ুই যে দেওয়া হয়নি। এখানে এসে নিয়ে যাও যে যার আয়ু।

বিধাতাপুরুষের তলব পেয়েই হুপহাপ শব্দ করতে করতে সবার আগে এসে হাজির বাঁদর। তাকে দেখে খুশিই হল বিধাতাপুরুষ। বলেন, বাঃ, আমার ডাক পেয়ে বেশ চটপট চলে এসেছে তো। যাও তোমার আয়ু দিলাম ষাট বছর।

বাঁদর সরে দাঁড়াবার আগেই সোঁ সোঁ করে উড়ে আসে শকুন। বিধাতাপুরুষের সামনে ডানা গুটিয়ে বসার মধ্যেই ফোঁস ফোঁস করতে করতে আসে সাপও।

বিধাতাপুরুষের আনন্দ যেন ধরে না। তাঁর সৃষ্টির দল হাঁক পেয়েই কেমন ছুটে এসেছে। বেশ বাধ্য সুবোধ এরা। খুশিতে বিধাতাপুরুষ শকুন আর সাপকেও আয়ু দিলেন ৬০ বছর করেই।

মানুষ এল সবার পরে হেলতে দুলতে। মানুষকে দেখে বিধাতা-পুরুষ বল্লেন, এতক্ষণে আসার সময় হল? সবাইকে সব আয়ু দিয়ে ফেললাম। যাকগে, তোমাকে দিচ্ছি এই ৪০ বছর আয়ু।

৪০ বছর আয়ু পেয়েই মানুষ বেশ খুশি। আনন্দে গান গাইতে গাইতে ফিরে যায় সে পৃথিবীর দিকে।

সেই পথেতেই দেখা হয়ে গেল তার বাঁদর, শকুন আর সাপের সঙ্গে। মানুষকে অমন গান গাইতে দেখে তারা ভাবে, বিধাতাপুরুষ বোধহয় মানুষকে অনেক বছর আয়ু দিয়েছেন তাই অমন খুশি সে।

মানুষকে বিধাতাপুরুষ বেশি আয়ু দিয়েছেন ভেবেই হিংসায় একটা কালো মেঘ উঠল তাদের মনের আকাশে। মানুষের আয়ু জানার জন্য তারা বলে, মানুষভাই, মানুষভাই, বিধাতাপুরুষ কত বছর আয়ু দিলেন তোমাকে।

অনেক—অনেক বছর।

কত—কত বছর?

৪০ বছর।

কথাটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা। যাক তাদের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তাতেই মানুষের অত আনন্দ দেখে তারা বলে,

কিন্তু মানুষ ভাই, বিধাতাপুরুষ তোমাকে ঠকিয়েছেন।

কেন, ঠকিয়েছেন কেন ?

তোমাকে আয়ু দিলেন মাত্র ৪০ বছর আর আমাদের দিয়েছেন তিনি ৬০ বছর করে।

তাই নাকি ?

তবে আর বলছি কি ? তুমি বরং বিধাতাপুরুষকে গিয়ে বল, আমাকে এত কম আয়ু দিলেন কেন ?

বলব ! রেগে যাবেন না তো তিনি ?

রেগে যাবার কি আছে ? বেশ, তোমার যদি ভয় করে, তাহলে আমরাও না হয় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

মানুষ বলে, সে তো খুবই ভাল হয়। এবার মানুষ, বাঁদর, শকুন আর সাপ ফিরে চলল বিধাতাপুরুষের কাছে।

বিধাতাপুরুষ তাদের দেখেই বলেন, আবার কি হল, তোমাদের তো আমি আয়ু দিয়েই দিলাম একটু আগে।

তা দিয়েছেন। মাথা চুলকে বলে মানুষ।

তবে ?

ওদের অত বেশি করে দিলেন, আর আমার বেলায় এত কম!

কথাটা শুনেই বিধাতাপুরুষের মাথায় যেন রক্ত উঠে যায়। কী, আমি যা দিলাম তাতে খুশি নয় ; তা নিয়ে আবার কথা।

বিধাতাপুরুষকে রাগতে দেখেই মানুষ জড়োসড়ো। বলে, আমি তো খুশিই ছিলাম ওই ৪০ বছর আয়ুতে। কিন্তু ওরাই তো বলল, আমাদের অনেক বেশি বেশি আয়ু দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ ; তুমি বল, দরবার করলেই তোমার আয়ুও দেবেন বাড়িয়ে।

কথাটা শুনে বিধাতাপুরুষের রাগ আরো বেড়ে গেল। বুঝলেন বাঁদর, শকুন আর সাপই যত নষ্টের গোড়া। ওরাই মানুষের মনে ঢুকিয়েছে অসন্তোষ, অবিশ্বাস, হিংসা। তাই তিনি রেগে গিয়ে ওদের বলেন, যেমন তোমরা বিষিয়ে দিয়েছো মানুষের মন, তেমন শাস্তি হিসেবে আমি তোমাদের আয়ু থেকে কেটে নিচ্ছি ২০ বছর করে। আর সেটা দিচ্ছি মানুষকে।

বাঁদর, শকুন, সাপ আর কি করবে। ভুল যা করেছে, অন্যায় যা করেছে তার শাস্তি তাদের পেতেই হবে। বিধাতাপুরুষের কথাও তাদের মানতেই হবে। তাই মাথা নিচু করে মেনে নেয় তারা বিধাতাপুরুষের কথা।

বিধাতাপুরুষ এবার মানুষকে বলেন, তুমি অন্যের কথায় নেচেছ। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারনি পুরোপুরি, তাই তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে।

মানুষ ভয়ে চুপচাপই থাকে। বিধাতাপুরুষ বলেন, ওদের কাছ থেকে কেটে যে বাড়তি ৬০ বছর আয়ু দিলাম তোমাকে তার ফলও ভোগ করতে হবে তোমাকে। ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তুমি হবে ওই বাঁদরের মতোই লোভী। ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে ওই শকুনের মতো হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুলিয়ে আর ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত তোমাকে দিন কাটাতে হবে ওই সাপের মতো বিছানায় শুয়ে শুয়ে। যাও, এবার তাড়াতাড়ি সরে যাও এখান থেকে।

একরাশ দুঃখ মাথায় নিয়ে চারজনেই তাড়াতাড়ি সরে যায় বিধাতা-পুরুষের সামনে থেকে। ভয় হয় তাদের, সামনে থাকলে হয়তো রেগে

আরো কড়া শাস্তি দিয়ে বসবেন। তাই তারা ছোটে পৃথিবীর দিকেই যেতে যেতে বাঁদর, শকুন আর সাপ ভাবে, কি দরকার ছিল মানুষে মনে হিংসা ঢোকানোর। মাঝখান থেকে নিজেদের আয়ুর কুড়িটা ক বছর গেল কমে।

মানুষও ভাবে, ওদের কথায় না নাচাই ছিল ভাল, বিধাতাপুরুষ য দিয়েছিলেন তাতেই খুশি থাকা উচিত ছিল। তা যখন করিনি তার ফল ভোগ করতে হবে আমাকেই।

সত্যিই তাই। তারপর থেকেই মানুষ তার ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বেশ লোভী হয়ে পড়ে। সব সময় খালি ছুকছুক করে। ৬০ বছরের পর তার পিঠ যায় বেঁকে, মাথা যায় ঝুলে, কোন কাজকর্মও করতে পারে না—বসে থাকে হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে। ৮০ বছরের পর তাও পারে না—সে তখন বিছানায় পড়ে থাকে চিৎপটাং হয়ে ওই সাপেরই মতো। আর ওই ভাবেই একদিন যায় সে মরে। মরার আগে ভাবে, আর কখনও অবাধ্য হবে না বিধাতাপুরুষের। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে—শাস্তি যা পাবার পেতেই হয় তাকে।

চালাক বুড়োর টাকাকড়ি

পাথর কুঁদেই দিন কাটত সেই বুড়োর। একদিন পাথর নিতে গিয়ে বুড়ো দেখে পাথরের একটা ফোকরের মধ্যে ড্যাবড্যাবিয়ে তাকিয়ে আছে একটি সোনাব্যাঙ। ব্যাঙটার রঙ যেমন সোনালি সবুজ, ঠিক তেমনি তরতাজা সেই ব্যাঙটা।

ব্যাঙটাকে দেখেই বুড়োর বুকে উথাল-পাতাল করে উঠল পরিবর্তনের ঢেউ। বুড়ো ভাবে, শুকনো খটখটে এই নীরস পাথরের মধ্যে থেকেও ব্যাঙটা কেমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পাথরের ফোকরেও তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বিধাতাপুরুষ। আর সে—সে কিনা এই বুড়ো বয়সেও ছুটো খাবার জোগাড়ের জন্য দিনরাত কুঁদে যাচ্ছে এই পাথরের চাঙর।

মনে মনেই ভাবে বুড়ো, ইস কি বোকা আমি। একবারও কেন মনে হয়নি, কপালে যা আছে তা জুটবেই। কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না তা থেকে। তাই বুড়ো ঠিক করে ফেলে। আর কাজ নয়, এবার সে ঘরেই দিন কাটাবে শুয়ে বসে। দেখবে বিধাতাপুরুষ কি মেপে রেখেছেন তার জন্য।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। বুড়ো সব কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত শুয়ে থাকে ঘরে। পাড়া প্রতিবেশী যারা তারা ভাবে, হল কি বুড়োর? কাজ ছেড়ে দিনরাত শুয়ে থাকে—ওর খাওয়া জোটে কোথা থেকে?

সত্যি কথা বলতে কি, সারা গাঁয়ের মানুষ বুড়োর কাজ ছাড়ার কারণটা জানার জন্য ছটফট করতে থাকে। কিন্তু জানতে পারে না কিছুই। এমন কি বুড়িকেও কিছু বলে না বুড়ো। তাই বুড়ির কাছ থেকেও শুনতে না পেয়ে পেট যেন ফুলতে থাকে গাঁয়ের মানুষের।

কিছু দুষ্টু লোক ঠিক করে নেয়, বুড়ো নিশ্চয় খোঁজ পেয়েছে কোনো গুপ্তধনের—সেই টাকাতেই কাটাচ্ছে দিন পায়ের ওপর পা তুলে। গাঁয়ের সেই দুষ্টুদের চারজন ঠিক করে, জানতে হবে রহস্যটা। চুরি করতে হবে বুড়োর টাকা।

চার চোর রাতের অন্ধকারে আড়ি পাতে বুড়োর ঘরে। বুড়ো তখন বিছানায় শুয়ে দেখছে একটা স্বপ্ন। বিড়বিড় করে বলে চলেছে বুড়ো তার স্বপ্নের কথাগুলো।

বুড়ি, ও বুড়ি, শোন না কেনে, কুয়োতলায় পাড়ে রয়েছে যে লেবুগাছটা—তার তলায় রয়েছে একটা কলসি। যেমন তেমন কলসি নয়, টাকা ভর্তি কলসি। কাল সকালেই লেবু গাছের গোড়াটা খুঁড়ে বের করে নিতে হবে টাকার কলসিটা।

চার চোর শোনে বুড়োর স্বপ্নের কথা। তারপর বলে, থাক বুড়ো এখন শুয়ে, সকালে উঠে দেখবে সব ভোঁ-ভোঁ।

বাড়ির কানাচ থেকে চার চোরে চলে যায় কুয়োতলায়। কুয়োতলার পাড়েই রয়েছে একটা লেবুগাছ। চারজনে এবার খুঁড়তে থাকে গাছের তলাটা। খানিকটা খোঁড়াখুঁড়ি করতেই ঠং করে শব্দ হয়। তারা টেনে তোলে সেটা—সেই কলসিটা।

লোভে চিকচিক করে ওঠে চার চোরের চোখ। তাড়াতাড়ি তারা কলসির ঢাকনাটা খোলে। তারপরেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে উফ্ বলে।

কলসির মুখে রয়েছে বোলতার চাক। নাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসে বোলতা চাক ছেড়ে। হুল ফোটাতে থাকে চার চোরকে। বোলতার হুলে নাস্তানাবুদ চার চোর তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয় ঢাকনা।

বোলতার হুলের জ্বালা বড় জ্বালা। চার চোর সেই জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বলে, হতচ্ছাড়া বুড়ো, আমাদের নাকাল করা, দেখাচ্ছি তোমাকে মজা।

চার চোরে কলসিটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বুড়োর ঘরে। বোলতার হুলে প্রাণ যাচ্ছে বুড়োর এই ভেবে চার চোর যেই ফিরেছে অমনি তারা শোনে টাকার ঝনঝন শব্দ। বুড়োর ঘরে কলসি থেকে পড়ছে টাকা।

চার চোরের আক্কেল গুড়ুম। কোথায় বুড়োকে বোলতায় কামড়াবে, তা নয় মাটি খুঁড়ে তারা বের করল যে কলসি তার টাকা-গুলো পেয়ে গেল বুড়ো। আর তাদের ভাগ্যে জুটল কিনা লবডঙ্কা। বোলতার হুলে ফুলে ওঠা মুখে হাত বোলাতে বোলাতে তারা বলে, জেনে রাখ বুড়ো, ও টাকা তোমার ভোগে লাগতে দেব না কিছুতেই। কালকেই চুরি করে নেব তোমার ওই টাকা।

বিষের জ্বালায় চোরগুলো বোধহয় একটু জোরেই বলেছিল কথাগুলো। তাই বুড়ো শুনে ফেলল তাদের কথা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মটকে বুড়োও ঠিক করে ফেলে মতলবটা। বুড়িকে ডেকে বলে, ও বুড়ি কাল আমি জিজ্ঞেস করলে যেমন শিখিয়ে দিচ্ছি—তেমনি উত্তর দিবি কিন্তু।

বুড়ি বলে, তা আর বলতে। কিন্তু জিজ্ঞেস করবে কি আর আমিই বা উত্তরটা দেব কি?

শোন, আমি বলব, ও বুড়ি টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস? তুই বলবি খড়ের চালার নিচে মাচার ওপর, কেমন?

বুড়ি জোরে জোরে মাথা নাড়ে তিনবার। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

পরদিন রাতে চার চোর বুড়োর বাড়ির কাছে আসতেই ঠিক টের পেয়ে যায় বুড়ো। তারপর চেঁচিয়েই বলে, ও বুড়ি, টাকাগুলো তুই কোথায় রেখেছিস?

বুড়িও বেশ জোরেই বলে, কেন, চালার নিচে ওই মাচাটার ওপর।

কথাটা শুনতে পেয়ে চার চোর বলে, বরাতটা আমাদের সত্যি ভাল। না হলে এত সহজে জানা যায় টাকাটা রয়েছে কোথায়?

এবার সলা করতে বসে চার চোরে। ঠিক করে ঘরের চালার খড় সরিয়ে একজন টুক করে নেবে পড়বে মাচার ওপর। তারপর টাকার কলসিটাকে ওপরে তুলে দিয়ে সরে পড়বে সেখান থেকে।

ফন্দি মাফিক ঘরের চাল ফাঁকা করে এক চোর তার পা-টাকে নামিয়ে দেয়; কিন্তু মাচার হদিশ পায় না। সে অন্যদের বলে, কই মাচা তো নেই! তার তিন সঙ্গী বলে, নিশ্চয় আছে—তুই দু-পা ঝুলিয়ে নেমে পড় ঝুপ করে।

সেই প্রথম চোর তাই করে। সতিই কিন্তু চালার নিচে মাচা ছিল না। তাই চোরটা গিয়ে ধপাস করে শক্ত মাটির মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। বুড়ো তার পেছনে একটা লাথি মেরে বের করে দেয় ঘর থেকে। বলে, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—এইবার বাড়ি চলে যাও যাদু।

প্রথম চোর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে যায় তার সঙ্গীদের কাছে। চার

চোরেই বলে, বেশ আজকের মতো রেহাই দিলাম। কালই দেখব, কেমন করে টাকা রাখ তুমি ঘরে।

বুড়ো কিন্তু শুনে ফেলে এই কথাগুলোও। তাই বুড়িকে বলে, কাল যখন জিজ্ঞেস করব, বুড়ি টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস ; তখন বলবি চাল রাখার ওই বেতের পাত্রটার মধ্যে।

পরদিন রাতে আবার আসে চার চোর। টের পেয়েই বুড়ো বলে, ও বুড়ি টাকাগুলো এবার কোথায় রেখেছিস ? বুড়ি বলে, চাল রাখার ওই বেতের পাত্রটার মধ্যে।

চার চোরে এবার সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকে। ঘরের কোণে দেখতে পায় চালের পাত্রটা। তারপর সেটাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায় সিঁধকাটা গর্ত দিয়ে।

এদিকে বুড়ো ছোট্ট একটা ধারালো দা নিয়ে আগে থেকেই ঢুকে ছিল ওই বেতের পাত্রে। তাই ওটা বেশ ভারি লাগে চোরদের। একজন বলে, এটা এত ভারি কেন বলত ?

অন্যজন বলে, দূর মুখ্যু। শুনলি না, চাল রাখার পাত্র—চাল আছে তাই ভারি।

চোরেদের কথা শুনে মনে মনে হাসে বুড়ো। বেতের পাত্রে চোরদের কাঁধে চেপে বেশ আরামেই চলে বুড়ো। চলার পথে পড়ে একটা ছোট নদী। নদী পাড় হবার সময় জল ঢুকতে থাকে পাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো চেঁচিয়ে বলে ওঠে, এই, হচ্ছেটা কি ? আমি ভিজে গেলাম যে, তোল তোল ওপরে তোল।

চমকে ওঠে চার চোর। আওয়াজ আসে কোথা থেকে ? বুঝতে না পেরে তারা বেতের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে যায়। ভারি পাত্রটা

আবার নিচু হতেই আবার জল ঢোকে পাত্রে। বুড়ো আবার চেঁচিয়ে ওঠে, আরে আরে আমার পেছনটা যে একেবারে ভিজে গেল। শিগগির ওপরে তোল পাত্রটা।

চার চোর এবার বুঝতে পারে, আবার ঠকেছে তারা। বুড়োটা রয়েছে পাত্রের মধ্যে। আরাম করে সে চলেছে তাদের কাঁধে চড়ে। রেগেমেগে তারা পাত্রটা ফেলে দিয়ে রওনা হয়।

বুড়ো বেড়িয়ে আসে পাত্র থেকে। তারপর তার সেই ছোট্ট দা'টা তুলে তার সে কী তড়পানি। ওরে পালাচ্ছিস কেন, আয় নিয়ে যা টাকা। তোদের টাকা নেবার সাধ আমি একবারে মিটিয়ে দেব—আয়।

আর আয়—চার চোর তখন ছুট দিয়েছে জোরে তাই দেখে বুড়ো এবার হাসতে থাকে হি-হি করে।

হাতির বন্ধু পেঁচা

সে এক রুপো নদী। দূর পাহাড়ের কোল থেকে নেমে কলকল খলখল করে কথা বলতে বলতে বয়ে চলেছে ঘন জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে গাঁয়ের পথে। সেই রুপো নদীর ধারে এক গাছ। তাতে বাসা বেঁধেছে এক পেঁচা।

পেঁচা হলেও ভুতুম নয় সে মোটেই। দিনের বেলা গাছের কোটরের মধ্যে থাকে ঘুমিয়ে। আর সূর্য যেই পাটে বসল অমনি আড়মোড়া ভেঙে ওঠে সে। একটু একটু করে রাত নামে—পেঁচাও ডানা মেলে আকাশে।

এদিক ওদিক ঘুরে জোগাড় করে খাবার। গাছের ডালে বসে বেশ আয়েস করে খেতে থাকে তা। ততক্ষণে চাঁদ ওঠে আকাশে। রুপো নদী করে আরো চকচক। পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসে মস্ত শুঁড়ওলা এক হাতি।

হাতির সঙ্গে পেঁচার ভারি ভাব। নদীর জলে গা ভাসিয়ে বসে থাকে হাতি আর গাছের ডালে দোল খেতে খেতেই পেঁচা গল্প করে হাতির সঙ্গে। সে কত রাজ্যের গল্প। গল্পে গল্পে কেটে যায় রাত।

এক সময় পূব আকাশে লাগে লাল—সূর্যি ঠাকুর উঁকি মারে একটু একটু করে। পেঁচা আবার ঢুকে পড়ে তার কোটরে—

হাতিও চলে যায় বনে।

নদীর পাড়ে গাছ। স্রোতের টানে মাটি যায় ধুয়ে, আলগা হয়ে আসে শেকড়। তারপর একদিন হুড়মুড়িয়ে পড়ে সে গাছ নদীর জলে। গাছের ডালে পেঁচা—ঘর হারানোর ব্যথায় কাঁদে।

এমন সময় আসে হাতি। শুঁড় তুলে বলে হয়েছে কি? কাঁদছ কেন?

পেঁচা বলে, গাছ গেছে পড়ে, আমি থাকব কোথায়?

কেন, অন্য কোন গাছে।

কিন্তু এই গাছটাই যে ছিল ভাল। তুমি তোমার শুঁড় দিয়ে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দাওনা গাছটাকে।

পেঁচার কথায় হাতি তার ওই মস্ত শুঁড় দিয়ে ঠেলে তোলে গাছটাকে। তারপর যেখানকার গাছ সেইখানেই তাকে দেয় দাঁড় করিয়ে।

পেঁচা এখন দারুণ খুশি। হাতির সঙ্গে তার এখন চলে আরো বেশি করে গল্প। গল্পে গল্পে অনেক সময় সে ভুলে যায় খাওয়ার কথা, হাতিরও হয় না নদীতে স্নান করা।

সেদিন আবার মা পার্বতীর বাহন সেই বাঘটা দেখে বসল একটা জব্বর স্বপ্ন। দেখল সে চিবিয়ে খাচ্ছে হাতির মাথাটা। স্বপ্নের মধ্যেই বাঘের জিভ দিয়ে ঝরতে থাকে জল। ঘুম ভেঙে যায় তার। ঘুম ভাঙা চোখে আবার সে ভাবে, আহা, যদি সত্যি হতো স্বপ্নটা—তাহলে হতো বেশ।

স্বপ্নর কথা ভেবে শিরদাঁড়া সোজা করে বার দুই ডন বৈঠক দিয়ে নেয় বাঘটা। তারপর বাবা মহাদেবকে শোনায় স্বপ্নের কথা। বলে,

আচ্ছা স্বপ্নের ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে না ?

কেন পারে না ? হাতির মাথাটা থাবা মেরে খেয়ে নিলেই হয়।

কথাটা শুনে ফুর্তি আর ধরে না বাঘের। বার দুই হালুম বলেই তিন লাফে চলে আসে নদীর ধারে—হাতিটা যেখানে নাইছে।

পার্বতীর বাঘকে দেখে হাতি বলে, কি ব্যাপার ভায়া, আজ হঠাৎ এদিকে ?

হঠাৎ আর বলি কি করে ? স্বপ্ন দেখলাম তোমার মাথাটা চিবুচ্ছি। বাবা মহাদেবকে বললাম, বাবা, স্বপ্ন কি সত্যি হতে নেই ?

বাবা বলল, কেন থাকবে না, সত্যি করে নিলেই হয়। সে কথা শুনেই চলে এলুম তোমার কাছে—থাবা মেরে ভাঙব এবার মাথা ঠিক পাকা বেলের মত। তারপর একটু একটু করে খাব তোমার মাথার ওই কাঁচা ঘিলু।

বাঘের কথা শুনে হাতির মাথা ঘুরতে থাকে, চোখে অন্ধকার দেখে সে। অতবড় শরীরটা থেকে বেরিয়ে আসে একটা মিনমিনে আওয়াজ, বাবা মহাদেব আমার মাথা ভাঙতে বলেছে ?

নাহলে কি আর এমনি এলাম ? নাও তৈরি হ-ও—এবার মাথাটাকে থাবার ঘায়ে চিরে ফেলি।

হাতিটা এবার ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে। আর তা দেখেই ছলছলিয়ে ওঠে পেঁচার চোখ। গাছের ডালে বসে এতক্ষণ সে শুনছিল সবার কথা। তার একটা মাত্র বন্ধু এই হাতি, আর তাকে কিনা মেরে ফেলতে চায় বাঘ। না, কিছুতেই তা হতে পারে না—বাঁচাতে হবে হাতিকে।

গাছের ডাল থেকে উড়ে বার কয়েক সে পাক খায় বাঘকে।

তারপর বলে, হু, হু শুনলুম তোমার কথা। কিন্তু সত্যিই বাবা মহাদেব একথা বলেছেন কিনা তাতো জানি না। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে কিছুতেই দিতে পারি না তোমাকে এই হাতির মাথা ভাঙতে। চল বাবা মহাদেবের কাছে। তিনি যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে তুমি ভেঙো হাতির মাথা।

বাঘ এক কথাতেই রাজি। সে তো জানে একটু আগেই বাবা মহাদেব বলেছেন তাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনায়াসে সত্যি করে নিতে পার তোমার স্বপ্নকে। মহাদেবের সে কথা শোনার পরই না সে এসেছে এখানে। তাই পেঁচার এক কথাতেই রাজি সে।

বাঘ, হাতি আর পেঁচা। বন থেকে তিনজনে রওনা হল মহাদেবের প্রাসাদের দিকে। তিনজনে একসঙ্গে রওনা হলে হবে কি, তিনজনে চলছে তো তিন চালে। হাতি চলছে থপথপিয়ে, বাঘ লাফিয়ে লাফিয়ে আর পেঁচা মাটি ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে।

জঙ্গলের পথে রয়েছে নানা বাধা। আর আকাশ অবাধ। তাই পেঁচাই আগে এসে ঢোকে মহাদেবের প্রাসাদে।

আগে এলে কি হবে, পেঁচা আসল কথাটাই গেল ভুলে। এতটা পথ উড়ে এসে সে তলিয়ে যায় গভীর ঘুমে।

বাবা মহাদেব এবার পেঁচাকে প্রায় ধমকে বলে ওঠেন, এই হচ্ছেটা কি? এসেই যে ঘুমচ্ছো বড়? বলি চাও কি?

বাবা মহাদেবের কথায় একটা চটকা মেরে জেগে ওঠে পেঁচা। তারপরই বলে ওঠে, বাবা, ঘুমের মধ্যে ভারি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নটা তুমি সত্যি করে দাও না বাবা।

কী, কী স্বপ্ন দেখছিলে?

দেখছিলাম আমি যেন বিয়ে করেছি দেবী পার্বতীকে। বাবা, আমার স্বপ্নটা কি সত্যি হতে পারে না ?

ধ্যৎ কি যাতা বলছ। বাবা মহাদেব একেবারে তেড়ে আসেন। তাছাড়া স্বপ্ন হল স্বপ্ন। স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় নাকি ?

মুখ কাঁচুমাচু করে পেঁচা বলে, স্বপ্ন তাহলে সত্যি হয় না ?

না।

স্বপ্নে যা দেখা যায়—সত্যি তা করা যায় না তাহলে।

এক কথা বারবার কেন ? বলছি তো যায় না।

পেঁচা এবার একটু মুচকি হেসে উকিলের মতো বলে ওঠে, বাবা, স্বপ্নে যা দেখা যায় সত্যি যদি তা করা নাই যায়, তাহলে বাঘকে তুমি কি করে বললে, তার স্বপ্ন সে সত্যি করতে পারে ? সে চিবিয়ে খেতে পারে এই হাতিটার মাথা।

এতক্ষণে মহাদেবের মাথায় ঢোকে পেঁচার কথা। মাথাটা একটু চুলকিয়ে বলেন, বলেছিলাম নাকি বাঘকে। না, বাঘ, কখ্খনই তা হতে পারে না। হাতির মাথা তুমি চিবিয়ে খেতে পার না কোন রকমেই। যাও। যাও এবার সব।

হাতি আর পেঁচা ভক্তিভরে প্রণাম করে মহাদেবকে। বাঘও করে, তবে ব্যাজার মুখে।

হাতির পিঠে চড়ে বসে পেঁচা। তারপর হাসতে হাসতেই তারা দুজনে চলে যায় সেই রুপো নদীর ধারে গাছটার দিকে।

আর বাঘ—বাঘটা তার অমন সুন্দর ভোজটা মাঠে মারা গেল দেখে গোঁ-গোঁ করতে করতে রওনা হয় বনের উল্টো দিকে—নতুন খাবারের খোঁজে।

রাজার বাড়ি দেখতে গিয়ে

ওরা কখনও রাজাকে দেখেনি। রাজা কেন রাজধানীতেও যায়নি কখনও। ওরা মানে গাঁয়ের লোক। ওরা গাঁয়ে জন্মায়, গাঁয়েই বড় হয় কাজকর্ম করে, আবার গাঁয়েই মারা যায়। বছরের শেষে আসে রাজার লোক। ওরা জানে রাজাকে কর দিতে হয়, তাই তাদের কাছেই কর দিয়ে দেয়।

এমনিই চলছিল ব্যাপারটা। কিন্তু সেদিন হঠাৎ-ই গাঁয়ের কয়েক-জনের মাথায় চাপল খেয়ালটা,—চল একবার দেখে আসি আমাদের রাজার বাড়িটা।

এককথাতেই রাজি ওরা ক'জন। দল বেঁধে গামছায় চিঁড়ে মুড়ি বেঁধে ওরা রওনা হল। একদিন পৌঁছলও রাজধানীতে! অবাক চোখ মেলে ওরা দেখে রাজধানী—দেখে রাজার বড় বড় বাড়িগুলো।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন ঠিক রাজার নিজের বাড়ির সামনে, তখনই রাজার দারোয়ানরা ঘিরে ধরে ওদের। ওরা কিছু বোঝার আগেই দারোয়ানরা বেঁধে ফেলে। নিয়ে যায় রাজার কাছে।

রাজা তখন করছিলেন মৌতাত। তাই কোন কিছু শোনার সময় হল না তাঁর। একরকম চোখ বুজেই বলেন, যাও, রেখে দাও ওদের কারাগারে।

গাঁয়ের সহজ সরল মানুষগুলো বুঝতে পারল না ওদের কসুর

কি ? কোন দোষেতে ওদের কারাবাস ?

মানুষগুলো সহজ সরল। কিন্তু বোকা নয়। নয় বলেই নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল কথা। একজন বলে, যাই বল ভাই, ইনি ইনি নন, উনি। দ্বিতীয় জন বলে, উনিই যদি হবেন তাহলে উনি কোথায় ? তৃতীয় জন বলে, কেন, এমনও তো হতে পারে যে, উনি ছাড়াই উনি।

কারাগারের রক্ষী এতক্ষণ শুনছিল ওদের কথাবার্তা। কিন্তু ওই 'ইনি', 'উনি', 'উনি' ইত্যাদি কথাগুলোর একবর্ণ অর্থও বুঝতে পারে না। রক্ষীরা ভাবে, লোকগুলো কি পাগল ? না হলে এমন অর্থহীন আবোলতাবোল বকছে কেন ? তারা ধমকে বলে, এই কি বলছ তোমরা ?

লোকগুলো বলে, ও কিছু না।

'ও কিছু না' কথাটা শুনে পাহারাদারদের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তারা রাজার কাছে গিয়ে বলে, লোকগুলো বোধহয় পাগল। কি জানি 'ইনি, উনি' বলছে, আমরা তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

সব শুনে রাজারও কেমন যেন সন্দেহ হয়। তিনি তাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। হুকুম পাওয়া মাত্র পাহারাওলারা লোকগুলোকে রাজার সামনে হাজির করে। রাজা বলেন, এই তোমরা কী সব আবোলতাবোল বকছিলে ? কথাগুলোর অর্থ কী ?

লোকগুলো বলে, মহারাজ, আপনি আমাদের কয়েদে পুরেছেন, এমনি এমনি শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আপনি রাজা। আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন উত্তর নিশ্চয়ই দেব। তবে অপরাধ নেবেন না যেন।

না, না, অপরাধ নেব না, বল তোমরা কি বলছিলে ?

মহারাজ ! আমরা বলছিলাম ইনি উনি নন, উনি—অর্থাৎ ইনি রাজা নন, উনি। উনি মানে ওই ষাঁড়টা।

সেকথা শুনে তন্যজন বলল, ইনি যদি উনি তাহলে উনি কোথায় ? অর্থাৎ ইনি যদি ষাঁড় তবে ওর শিং কোথায় ?

সেকথা শুনে অন্যজন বলল, কেন এমনও তো হতে পারে যে উনি ছাড়াই উনি অর্থাৎ শিং ছাড়াও তো ষাঁড় হতে পারে।

কথাগুলো শুনেই রাগে রাজা লাল। যেন কড়াইতে তেল ফুটছে টগবগ করে। চিৎকার করে বলে ওঠেন তিনি, কী এতবড় সাহস তোমাদের ? আমাকে বলছ কিনা একটা ষাঁড় ! আমি এখুনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।

লোকগুলো আবারও বলে, মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। আমরা কথাগুলো কেন কিজন্য বলছিলাম, তা যদি একটু শোনেন—

বেশ বল কিজন্য বলছিলে তোমরা ?

মহারাজ একটা ষাঁড়েব যতটুকু বুদ্ধি, বিচারশক্তি আছে আপনার তাও নেই দেখেই কথাগুলি বলছিলাম। একটা ষাঁড় আর কিছু না জানলেও, জানে কোনটি গোয়াল ঘর, কোনটা ঘাস, কোনটা জাবনা এইসব। অথচ আপনি রাজা, আপনি সেইটুকু বুদ্ধিও খরচ করতে চান না দেখে, কোনকিছু না শুনেই আমাদের কয়েদ করান দেখেই ওকথা বলা।

রাজা এবার একটু লজ্জা পেয়ে যান। তাই একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে বলেন, তা তোমরা কারা ? উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন ?

লোকগুলি বলে, মহারাজ, আমরা আপনারই প্রজা। আমরা থাকি গাঁয়ে। আমাদের বাপঠাকুর্দারাও থাকত গাঁয়েই। কোনদিন তাঁরা রাজাকে দেখেননি, রাজধানীও দেখেননি। আর না দেখেই তাঁরা মারাও যান। তাই আমাদের ইচ্ছে হয়েছিল একটু রাজধানীটা দেখার, আপনার বাড়িটা দেখার, আপনাকে দেখার, তাই এসেছিলাম এখানে। কিন্তু এখন দেখছি না আসাই ছিল ভাল। না এলে রাজধানী দেখা হত না ঠিকই, কিন্তু কয়েদ খাটতে হত না।

ওদের কথা শুনে রাজা লজ্জা পেলেন আরও বেশি। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন ওদের ছেড়ে দাও।

তারপর বেশ ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে লোকজনদের বললেন, ওদের বেশ ভাল করে সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দাও।

এবার ওরা আনন্দেই দেখল সব কিছু। তারপর রাজাকে প্রণাম করে বলে, মহারাজ, আমাদের বিদায় দিন। আমরা ফিরে যাই আমাদের ছোট্ট গ্রামে।

রাজা হাসিমুখে তাদের বিদায় দিলেন—দিলেন নানা রকম উপহার আর নিজের রথে করে পেঁাছে দিলেন তাদের সেই ছোট্ট গাঁয়ে।

আর ওরা রাজদর্শনের ফল হাতে পেয়ে, রাজার জয় দিয়ে আনন্দে গান গাইতে গাইতেই ফিরে এল তাদের সেই পুরনো ছোট্ট গাঁয়ে।

মনটা হল আসল রাজা

সেই যে সেই গ্রামটা, আহা, নাম একটা ধরে নাও না। সেই গ্রামেতেই থাকত দুজন লোক। একজন যেমন কদাকার কুচ্ছিত অন্যজন তেমনি সুন্দর—অনেকে বলত যেন ময়ুর ছাড়া কার্তিক।

যে লোকটি কদাকার সে জানত তার চেহারার কথা বেশ ভাল-ভাবেই। জানত, তার রূপের জন্যই কেউ ফিরে তাকাবে না তার দিকে। এটাও সে জানত শরীরের সৌন্দর্যটা স্থায়ী কোন ব্যাপার নয়, মনের সৌন্দর্যটাই সব। মানুষকে মানুষ মনে রাখে তার মানসিক সৌন্দর্য আর কাজের জন্যই। তাই সে করত ভালো কাজ। সব সময় চেষ্টা করত সৎ সুন্দর কিছু করতে।

আর যে লোকটিকে দেখতে সুন্দর সে দিনরাত রূপের গরবেই মরত। দিনরাত নিজেকে কি করে আরো সুন্দর দেখায় তার জন্য ব্যস্ত থাকত। শুধু তাই নয়। তার রূপের দৌলতে নানা রকম আমোদ আহ্লাদেই দিন কাটাতে ভালবাসত সে। আমোদের জন্য যে কোন অন্যায় কাজ করতেও এতটুকু পিছপা ছিল না সে।

দিন যায়। বয়স বাড়ে। বুড়োও হয় দুজনেই। আর হ'ল কি দুজনেই মারা গেল একই দিনে। কদাকার সৎ মানুষটির মৃত্যুতে সবাই খুব দুঃখ পেল। আর রূপবান দুষ্ট লোকটির মৃত্যুতে সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। এতদিনে যে তার হাত থেকে

রেহাই পাওয়া গেল এই ভেবে খুশিও হল সবাই।

যাইহোক, দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে।

চিতায় যখন তোলা হল তাদের, সেই সময়েই সেখানে হাজির একজন লোক হেসে উঠল কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে। তার সেই উঁচু গলার হাসিতে বিরক্তও হল সবাই। শ্মশানে এসে হাসা, এযে রীতিমত অসভ্যতা। তাই বিরক্তি থেকে রাগও এল তাদের।

রাগ বিরক্তি থেকেই সবাই বলে লোকটিকে, কি ব্যাপার হঠাৎ অমন বেয়ারাভাবে হেসে উঠলে যে?

লোকটিও ততক্ষণ বুঝে গেছে অবস্থাটা। তাই শান্তভাবে বলে, হাসির কারণ আছে একটা।

কী সে কারণ?

এখন বলব না। গাঁয়ে ফিরে বারোয়ারি তলায় সবার সামনে বলব সব কথা। লোকজন মেনে নিল তার কথা।

এক সময় শেষ হল শ্মশানের কাজ। ফিরে গেল সবাই যে যার ঘরে।

পরদিন বারোয়ারি তলায় সবাই হাজির। এল সেই লোকটিও—যে হঠাৎ করে হেসে উঠেছিল শ্মশানে।

লোকটি এবার বলতে শুরু করল, ভাইসব, সে বহুদিন আগের কথা। একটা কাজে গিয়েছিলাম জঙ্গলে। গিয়ে দেখি, একটা তেমাথার মোড়ে পড়ে রয়েছে একটা মড়া আর কতকগুলো শকুন দেখছে মড়াটাকে।

পাশ কাটিয়ে যেই আমি চলে যাব, একটা বুড়ো শকুন বলে, ওহে, মড়াটাকে ওই তেমাথা থেকে যদি সরিয়ে দাও তাহলে খুব খুশি

হব, চাই কি তোমাকে একটা বরও দেব।

আমি ভাবলাম, এ আর কী এমন কাজ। তাই তেমাথা থেকে সরিয়ে দিলুম মড়াটাকে।

বুড়ো শকুনও তাতে খুশি হয়ে বলল, আমার কথা শুনেছ বলে খুব আনন্দ হয়েছে আমার। আজ থেকে তুমি শুনতে পাবে সব কথা—যা শুনতে পায় না আর পাঁচজনে, দেখতে পাবে সে সবও—যা দেখতে পায় না অন্যে, আর জানতে পারবে তাও যা অজানাই থেকে যায় অন্য সবার।

সত্যিই তাই। সেদিন থেকে আমি দেখতে পাই—যা পায় না আর কেউ, জানতে পারি কিংবা শুনতে পারি সেসব যা পায় না কেউ। আর সেই ক্ষমতাতেই গতকাল আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, শুনেছিলাম—যাতে হাসি চেপে রাখতে পারিনি। ভাইসব, শ্মশানে ওভাবে হাসা উচিত নয় তা আমিও জানি। কিন্তু যদি সেই দৃশ্যটা দেখতে কিংবা কথাগুলো শুনতে তাহলে তোমরাও যে হেসে উঠতে এব্যাপারে আমি কিন্তু নিশ্চিত।

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, কী দেখেছিলে তুমি, কী শুনেছিলে?

লোকটি বলে, ঘটনাটা তোমাদের সবার চোখের সামনেই ঘটেছিল, কিন্তু একমাত্র আমিই সেটা দেখেছিলাম।

কী, কী সেটা?

চিতায় যখন ওদের দুজনকে তোলা হল তখন দেখলাম ভাল লোকটির আত্মা তার শরীরকে ছাড়তে চায় না কিছুতেই। সে ওই শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেয়ে বারবারই বলতে থাকে ওহে

আমার হতকুচ্ছিত শরীর, তোমার জন্য—হ্যাঁ শুধু তোমার জন্যই আমি করতে পেরেছি যত ভাল কাজ। উপকার করতে পেরেছি অন্যের সেও শুধু তোমারই জন্য। আজ আমার সেই শরীর—আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার জন্যই আমি যাব স্বর্গে। ও আমার শরীর! তোমাকে ছাড়তে কিছুতেই যে মন চায় না আমার।

অন্যদিকে সেই দুষ্টু লোকটির আত্মা কী করল, কী বলল শুনবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনব। বল তুমি।

দুষ্ট লোকটির আত্মা বলে উঠল, এই রূপ—এই শরীর—আমাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এরজন্যই ভুলে ছিলাম আমি ভগবানকে। এরজন্যই আমি করেছি হাজার হাজার অন্যায় কাজ। এই শরীরটাই পাপী। এইসব বলে রাগে দুঃখে আত্মা বারবার লাথি মারতে থাকল শরীরটাকে।

আর এসব দেখেই আমি হাসি চাপতে পারিনি ভাইসব। বল, আমি কী অন্যায় করেছি?

সবাই স্বীকার করল হেসে লোকটি কোন অন্যায় করেনি। সেই-সঙ্গে সবাই এটাও শিখল, শরীরের রূপ নয়, মনের রূপটাই খাঁটি। যে ভাল কাজ করে, ভাল কথা ভাবে এবং বলে সেই আসলে সুন্দর। শরীরের সৌন্দর্যের কোন দামই নেই।

রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের গল্প

রাজার ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলে। দুজনে একবারে গলায় গলায় ভাব। সব কাজেই দেখা যাবে ওরা দুজন রয়েছে একই জায়গায়, একই সঙ্গে। ওদের রকমসকম দেখে রাজ্যের লোক ওদের ডাকে মানিকজোড় বলে—অবশ্যই ওদের আড়ালে।

এই রাজার ছেলে আর মন্ত্রীর ছেলে শুধু যদি এমনি বন্ধু হতো তাহলে ভাবনার কিছু ছিল না কিন্তু দুটিতে মিলে দিনরাত শুধু ষড়যন্ত্র করত কেমন করে মানুষের ওপর উৎপাত করা যায় তাই নিয়ে। হেন অপকর্ম নেই যা এই দু'টিতে মিলে করত না। সত্যি কথা বলতে কি, রাজা আর মন্ত্রীর ছেলে বলেই রাজ্যের প্রজারা অনেকদিন একরকম মুখ বুজেই ওদের অত্যাচার সহ্য করেছে।

কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। তাছাড়া প্রজারা কোন প্রতিবাদ করে না দেখে ওরাও নিত্য নতুন অত্যাচারের ফাঁদ পাতে। শেষে একরকম অতিষ্ঠ হয়েই প্রজারা গিয়ে নালিশ করে রাজার কাছে।

সব শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় রাজার। প্রজাদের মিষ্টি কথায় বিদায় দিয়ে তিনি বলেন, খুব শিগগিরি তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

রাজার একমাত্র ছেলে সে যদি এমন বেয়াড়া আর অত্যাচারী হয় তাহলে তো রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রাজা ভাবেন যে করেই হোক শোধরাতে হবে রাজপুত্রকে। নানা চেষ্টাও করেন তিনি, কিন্তু দেখেন

তাতে শোধরাবার ছেলে নয় সে।

এবার ভাবেন, ওরা মানিকজোড় মিলেই এসব দুষ্কর্ম করে। তাই যদি ওদের জুটি ভাঙানো যায়, ওদের বন্ধুত্বে চিড় ধরানো যায়, তাহলে বোধহয় ফল পাওয়া যাবে। তাই দু'বন্ধুর বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য চেষ্টা করেন তিনি।

না, সে কাজেও ব্যর্থ হন রাজা। নানাভাবে চেষ্টা করেও ওদের বন্ধুত্ব ভাঙতে না পেরে তিনি ঘোষণা করে দেন, যে ওদের বন্ধুত্ব ভাঙতে পারবে তাকে তিনি অনেক পুরস্কার দেবেন।

পুরস্কারের লোভে অনেকেই আসে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের বন্ধুত্বে ফাটল ধরাতে। কিন্তু বন্ধুত্বে ফাটল তো ধরেই না, উল্টে তারাই আরো নাজেহাল হয়ে পালায়।

ব্যাপার দেখে রাজার প্রায় চোখের জল ফেলার অবস্থা। দিনরাত শুধু ভাবেন, দু'দিন বাদে যে রাজা হবে, সিংহাসনে বসবে—সে যদি এমন অত্যাচারী হয় তাহলে প্রজারা যে একসময় বিদ্রোহ করবে, রাজ্য যে ছারখার হবে। রাজা শুধু ভাবেন আর ভাবেন।

এমন সময় একদিন এক বুড়ি এসে হাজির রাজসভায়। রাজাকে প্রণাম করে বুড়ি বলে, যদি অনুমতি করেন তবে আমি ভেঙে দিতে পারি রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের বন্ধুত্ব।

বুড়ির দিকে তাকিয়ে রাজা ভাবেন, কত বুদ্ধিমান লোক বন্ধুত্ব ভাঙতে এসে নিজেরাই নাজেহাল হল আর এ তো সামান্য একজন গেঁয়ো বুড়ি, এ কি পারবে? মনে প্রশ্ন উঠলেও রাজা ভাবেন, পারুক বা না পারুক চেষ্টা করতে দোষ কী? তাই বলেন, যদি ওদের বন্ধুত্ব ভাঙতে পার তাহলে প্রচুর—প্রচুর পুরস্কার দেব।

বুড়ি রাজাকে প্রণাম করে বলে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয় পারব মহারাজ।

সেদিন সকালে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র বেরোবে এমন সময় বুড়ি এসে হাজির। বলে, তোমাদের সঙ্গে খুব জরুরি একটা কথা আছে।

দু'বন্ধু এক গলাতেই বলে, কী, কী কথা?

না, এখানে বলব না। রাস্তায় চল, যেতে যেতেই বলব সে কথা।

ওরা বলে বেশ চল।

তিনজনে বেরোয় পথে। এক বন্ধু দু'পা এগিয়েই চলেছে। অমনি বুড়ি পেছনের বন্ধুর একবাবে কানের কাছে মুখটা নিয়ে গেল। যেন কিছু সে বলবে। কৌতূহলী বন্ধুও তাই একটু ঝুঁকেই পড়ল তার দিকে।

বুড়ি কিন্তু কিছুই বলল না। শুধু তাই নয়, মুখটা সরিয়ে নিয়ে সে আর কিছু না বলে সোজা চলে গেল সেখান থেকে।

আগে ছিল যে বন্ধু সে দেখেছিল বুড়ি তার বন্ধুর কানে কানে কি যেন বলছে। তাই এগিয়ে এসে বলে, বুড়ি কী বলল বন্ধু?

বন্ধু হেসে বলে, আশ্চর্য বুড়ি, কিছু না বলেই সটকান দিল এখান থেকে।

অন্য বন্ধুর কিন্তু বিশ্বাস হল না কথাটা। সে নিজের চোখে দেখেছে বুড়ি তার বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যেন কী বলছে। তাই আবারও বলে, লুকোচ্ছ কেন, বল না, কি বলল?

অন্য বন্ধু বলে, বিশ্বাস কর, কিছু বলেনি। শুধু কানের কাছে মুখটা নিয়ে এল, তারপর একটা কথাও না বলে চলে গেল।

বন্ধুর মনে তখন ঢুকে গেছে অবিশ্বাসের পোকাটা। তার মনে

হল বন্ধু তাকে লুকোচ্ছে। তাই বার বার জানতে চাইল কী বলেছে বুড়ি।

সত্যিই তো বুড়ি কিছু বলেনি, তাই অন্য বন্ধু বলে, বিশ্বাস কর কিছুই বলেনি।

কিন্তু অন্য বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করে না সে কথা।

দু'জনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি, তা থেকে একরকম মারামারি। রেগেমেগে দু'বন্ধু পাড়ি দিল দু'দিকে।

বুড়ি এতক্ষণ আড়াল থেকে দেখছিল সব। দু'বন্ধু ঝগড়া করে দু'দিকে গেল দেখেই বুড়ি ছুটল রাজার কাছে। হাসতে হাসতে রাজার কাছে গিয়ে বলে, পেরেছি, মহারাজ পেরেছি। ওদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পেরেছি।

রাজা বলল, সত্যি পেরেছ ?

হ্যাঁ মহারাজ, ওই দেখুন ওরা দু'জন এখন দু'দিকে। রাজা দেখেন সত্যিই তাই। মানিকজোড় আর এক জায়গায় নেই। দু'জনে এখন দুই ঠাঁই। খুশি হয়ে রাজা বুড়িকে দেন অনেক, অনেক পুরস্কার।

রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রে এখন মুখ দেখাদেখি নেই। বন্ধুত্ব গেছে, তাই বন্ধ হয়েছে অত্যাচার। রাজ্যের লোকেরাও ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস। আর ধন্যি ধন্যি করে সেই বুড়ির, তারিফ করে তার বুদ্ধির।

চাষী আর তার ছেলে

এক ছিল বুড়ো চাষী। তার আপনার বলতে ছিল এক ছেলে। বুড়ো মরবার সময় ছেলেকে ডেকে বলে, দেখ বাপু, ছুটি কথা বলে যাই তোমাকে। কথা ছু'টি যদি মেনে চলতে পার তাহলে জীবনে কষ্ট পাবে না কখনও।

বুড়ো ছেলেকে বলে, দেখ, কখনও কোন সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে কোরো না। আর বিরাট বড় খামার কোরো না কখনও।

বুড়ো তো ছেলেকে উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে মরে গেল একদিন। ছেলের কিন্তু মন খচ্‌খচ্‌ করতেই থাকে। বাবা তো মানা করে গেল। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করলে কিংবা খামার বড় করলে ক্ষতিটা কী হয় তা তো বলল না?

দিনরাত প্রশ্নটা কাঠঠোকরার মত ঠক্‌ঠক্‌ করতে থাকে তার মাথায়। ছেলে বুঝতে পারে না কিছুতেই, ক্ষতিটা কী হবে?

তারপর একদিন ঠিক করে, বাবার কথা না শুনে সে ওই ছুটো কাজই করবে আর তাহলেই জানতে পারবে কেন বারণ করেছিল বাবা। ছেলেটি একরকম জীবনকে বাজি রেখেই তার বাবার কথা অমান্য করল।

সে বেশ বড় দেখে একটি খামার বানাল আর অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়েকে বিয়ে করল। বেশ সুখেই কাটতে থাকে দিন। সে ভেবে পায় না তার বাবার আপত্তি করার কারণটা কি?

একদিন দেশের রাজা বেরিয়েছে শিকারে। ঘোড়ায় চড়ে শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত রাজা হাজির হল একটা নদীর ধারে।

নদীর ধারেই ছিল সেই ছেলের বাড়ি। বউ তার জল আনতে যখন নদীতে এল—সেই সময়ই রাজা দেখল তাকে। মেয়েটিকে দেখেই তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে জাগল রাজার মনে। তাই মেয়েটি জল নিয়ে বাড়িতে ফিরতেই রাজাও হাজির।

রাজা মেয়েটিকে সরাসরিই বলে, দেখ তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমার তো রাজরাণী হবার কথা। তুমি এখানে পড়ে আছ কেন? তুমি এসো আমার সঙ্গে রাজবাড়িতে—আমি তোমাকে রাণী করব।

বউটি বলে ওঠে, বারে তা কি করে হবে? ঘরে আমার স্বামী রয়েছে, তাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

রাজা কিন্তু দমে না। কেন না জানে, মেয়েরা মুখে এককথা বলে কিন্তু মনে থাকে অন্য কথা। আর তাই নানা প্রলোভন দেখায় তাকে।

রাজার কথাই সত্যি হল। শেষে বউটি রাজি হল তাকে বিয়ে করতে। তবে একটি শর্ত দিল। তার চাষী স্বামীকে যে কোন একটা অপরাধে আটক করে হয় সারাজীবন কারাদণ্ড কিংবা মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে আগে, তারপর সে যাবে রাজার ঘরে।

হেসে রাজি হলেন রাজা। ঘোড়া টগবগিয়ে চলে যায় রাজা আর বউটি রাজবাড়িতে রাজরাণী হবার স্বপ্ন নিয়ে পড়ে থাকে চাষীর ঘরে।

চাষী আর বউ শুয়ে আছে সে রাতে, হঠাৎ বাইরে কেমন যেন গোলমাল শোনা যায়। ঘুম ভেঙে যায় চাষী আর তার বউয়ের।

চাষী প্রথমে বাইরে বেরোতে চায় না, কিন্তু বউ বারবারই বলে, যাও না একবার বাইরে দেখে এসো কি হচ্ছে।

বিপদ হতে পারে জেনেও বউ বারবার বাইরে যেতে বলাতে চাষী ছেলেটির কেমন যেন সন্দেহ হয়। তবু সে দরজা খুলে বাইরে আসে। দেখে রাজার ঘোড়া তার খামারের বেড়া ভেঙে সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে।

চাষী তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘোড়াটিকে ধরে, তারপর জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গায় ঘোড়াটাকে লুকিয়ে বেঁধে রেখে আসে।

ঘরে আসতেই বউ জিজ্ঞেস করে, কি গো, কী হলো ?

চাষী বলে সব। বলে রাজার ঘোড়াকে সে কেটে দু'টুকরো করে ফেলেছে। বউ যেন একথা কাউকে না বলে।

বউ আর মুখে কিছু বলে না। চাষীও হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ে আবার।

পরদিন ভোরে চাষী ওঠে। ওঠে গাঁয়ের অন্য লোকজনও। তাদের গরুবাছুর তারা ছেড়ে দেয় মাঠে। চাষীও তার খামারের বেড়া মেরামতের কাজে লেগে যায়।

চাষী দেখে, তার অতবড় খামারের চারিদিকের বেড়াই একবারে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে রাজার ঘোড়া। তাই একদিক থেকেই সে বেড়া বাঁধতে থাকে।

বেড়া বাঁধতে গিয়ে কিন্তু নাজেহাল হয়ে যায় চাষী। সে এদিকের বেড়া বাঁধে তো ওদিক দিয়ে ঢোকে গাঁয়ের যত গরু-বাছুর। আবার ওদিক বাঁধে তো সেদিক দিয়ে ঢোকে তারা। দৌড়োদৌড়ি করতে করতে চাষী সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পায়, কেন তার বাবা বড় খামার

করতে বারণ করেছিল।

মনে মনে সে বাবাকে প্রণাম করে বলে, বাবা গো, আমি পরীক্ষা করার লোভে তোমার কথা অমান্য করেছিলুম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বেড়া বাঁধতে বাঁধতে চাষী ভাবে যথেষ্ট শিক্ষা হল, এবার না জানি সুন্দরী বউ বিয়ে করার জন্য কি দুর্ভোগে পড়তে হয়। চাষী যখন এসব ভাবছে তখনই এসে হাজির রাজার সেপাই। রাজার ঘোড়াকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল সে।

চাষী কিছু বলার আগেই তার বউ বেরিয়ে আসে। বলে, কাল রাতে চাষী তাকে বলেছে, রাজার ঘোড়াকে সে কেটে দু'টুকরো করে দিয়েছে।

বউয়ের কথা শুনে আর কিছু না বলে সেপাইরা চাষীকে ধরে নিয়ে যায় রাজার কাছে। রাজাও সব শুনে মৃত্যুদণ্ড দেন তাকে।

মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনেই কিন্তু হেসে ফেলে ছেলেটি। তাকে হাসতে দেখে সবাই অবাক। রাজাও। জিজ্ঞেস করেন, কি ব্যাপার! মৃত্যু-দণ্ডের কথা শুনে তুমি হাসছ কেন?

চাষী বলে, মহারাজ, আমার বাবা মারা যাবার আগে আমায় বলেছিলেন, ওরে কখনও বড় খামার করবি না। আর কখ্খনও সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবি না। কিন্তু করলে কি হয় তা জানার লোভে বাবার দু'টি কথাই অমান্য করি আর ফলও হাতে হাতে পেলাম, তাই হাসছি।

কিরকম?

আপনার ঘোড়া আমার খামারবাড়ির সব বেড়া তছনছ করে দেয়। সে বেড়া মেরামত করতে গিয়ে দেখি, এদিক সারাই তো ওদিক দিয়ে

গরু ঢোকে। তখন বুঝলাম এইজন্যই বড় খামার করতে বারণ করেছিলেন। আর সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার ফল তো দেখছি, মৃত্যুদণ্ড। তাই হাসছিলাম।

মহারাজ, আপনার ঘোড়া মারিনি, তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম বাবার কথাটা পরীক্ষা করার জন্য। আপনি আদেশ করলেই ঘোড়াকে নিয়ে আসতে পারি।

রাজার আদেশে সত্যিই চাষী ফিরে এল ঘোড়া নিয়ে। রাজা এবার সব বুঝে মুক্তি দিলেন চাষীকে আর অবিশ্বাসী চাষীর বউকে দিলেন মৃত্যুদণ্ড। রাণী হবার বদলে চাষীর বউয়ের প্রাণ গেল ঘাতকের হাতে।

সতীমতি বাই

ওরা দুটি ভাইবোন। সতীমতি বাই আর তার ভাই। গাঁয়ের একটি কোণে থাকে ওরা দুটিতে। এ ত্রি-সংসারে কেউ নেই ওদের আপনার। তাই সব কিছুই করতে হয় ওদের নিজেদের।

ওদের বলা অবশ্য ঠিক হবে না। যা করার সবই করে সতীমতি বাই। ও যে বড়—দিদি। তাই ছোট ভাইটিকে একবারে বুক দিয়ে আগলে রাখে।

ভোরে উঠেই সতীমতি বাই লেগে যায় ঘরের কাজে। তারপর খাবারদাবার জোগাড় করা রান্না করা সবকিছু করে সতীমতি বাই।

ভাইটি কিন্তু তার তেমন নয়। ভীষণ জিদ্দিবাজ—আসলে ছোটরা যেমন হয় আর কি! ওরা যে খুবই গরিব, আর সবার মতো সবকিছু যে ওদের করা সাজে না—এই কথাটাই মাথায় আসে না তার। আসে না বলেই যখন তখন করে বসে অসম্ভব সব বায়না। একবারও ভেবে দেখে না, কেমন করে, কোথা থেকে মিটবে সব।

এই সেদিন যেমন। ছুটতে ছুটতে আসে ও। বাইরে থেকেই চিৎকার করতে থাকে সতীমতি বাই, সতীমতি বাই!

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সতীমতি বাই। বলে, কি হল অত চিৎকার করছিস কেন।

সতীমতি বাই, সতীমতি বাই, আজ পিঠে কর না। আমার আজ

পিঠে খেতে দারুণ সাধ হয়েছে।

ভাইয়ের কথা শুনে মুখ কালো করে সতীমতি বাই বলে, আমাদের যে অমন সাধ হতে নেই ভাই। আমরা যে বড্ড গরিব। দু বেলা পেটের ভাতই জোটে না—পিঠে খাই কোথা থেকে?

ওসব আমি শুনব না। আমার পিঠে খেতে ইচ্ছে হয়েছে, আমার পিঠে চাই, ব্যস। তুই পিঠে কর।

সতীমতি বাই করুণ মুখ করে বলে, পিঠে কি দিয়ে করব ভাই। চালের গুঁড়ো, গুড় এমন কি উনুন ধরাবার কাঠ কিছুই যে নেই।

দিদির মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ও। তারপর বলে, চালের গুঁড়ো, গুড়, কাঠ পেলে পিঠে করবি তো তুই।

তা কেন করব না। কিন্তু তুই পাবি কোথায় সে সব।

তোকে ভাবতে হবে না সে সব কথা। এই আমি নিয়ে আসছি সবকিছু। তুই তৈরি হ।

ঘরে ঢুকে এণ্ডির চাদরটা বের করে তাই দিয়ে মুড়ে নেয় নিজেকে। তারপর বেরিয়ে পড়ে।

সতীমতি বাই বলে, কিরে কোথায় যাচ্ছিস তুই চাদর গায়ে?

এই আসছি একটু। তুই কিন্তু পিঠে তৈরি করবি আজ।

সতীমতি বাই বলে, আচ্ছারে—আচ্ছা।

হাজির হয় ও ওদের এক প্রতিবেশীর বাড়ি। উঠোন জুড়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে সুন্দর বোরো ধান। তাই দেখে ওর চোখ চকচক করে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে গল্প করে যায় সে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ চিৎকার, ওরে বাবারে মরে গেলুমরে—ওরে বাবারে—

ব্যস্ত হয়ে প্রতিবেশী বলে, কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার ?

উত্তর দেবার আগেই একবার কঁকিয়ে ওঠে সে। তারপর বলে, পেটের ব্যথা। কথা শেষ না করেই যন্ত্রণায় সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। গড়াতে গড়াতে চলে যায় ধানের ওপর।

বেশ কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ে ও। বলে এবার একটু ভাল লাগছে—বাড়ি যাই।

বাড়ি এসেই হাঁক পাড়ে, সতীমতি বাই, সতীমতি বাই, দেখ কত ধান এনেছি। বলেই সে এণ্ডির চাদরটা ঝাড়তে থাকে। যত ঝাড়ে চাদরের সঙ্গে লেগে থাকা ধান ততই ঝরতে থাকে।

সব ধান জড়ো করে বলে, এতে হবে না সতীমতি বাই। দিদি হেসে বলে, হবে।

তবে তুই এগুলিকে কুটে চালের গুঁড়ি করে ফেল।

কিন্তু গুড় কোথায় ? কাঠ কোথায় ?

আনছিরে, আনছি। সবই আনছি।

এবার ও সোজা চলে যায় গাঁয়ের মুদিখানা দোকানে। দোকান-দারকে বলে, তোমার ছেলেটা হারিয়ে গেছে। তোমার বউ কান্নাকাটি করছে। শিগগিরি বাড়ি যাও।

দোকানদার দোকান ফেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছোটে আর সেই ফাঁকে ও বেশ খানিকটা গুড় এনে দিদিকে দিয়ে বলে, এবার পিঠে কর।

কিন্তু কাঠ না হলে উনুন জ্বালব কি করে ?

তাও এনে দিচ্ছি। কাটারিটা নিয়ে ও এবার যায় বনে। বেশ শুকনো দেখে কয়েকটা ডাল কেটেছে কি কাটেনি—এমন সময়

হালুম। দু'পা তুলে সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদো বাঘ। গর্জন ছেড়ে বলে, আমার জঙ্গলের কাঠ কাটছ কেন? আমি তোমায় খাব।

কাঁদকাঁদ হয়ে বলে ও, বাড়িতে আজ পিঠে হবে, কিন্তু একটুও কাঠ নেই—তাই।

পিঠে কথাটা শুনেই বাঘের মুখটা লালায় ভরে যায়। বার দুই তিন সে বলে, পিঠে?

সে-ও ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ পিঠে।

তাহলে কাঠ নিতে পার, কিন্তু একটা শর্তে।

কি শর্ত?

আমাকে যদি পিঠে দাও তাহলেই কাঠ দেব, নাহলে এই খেলুম—হালুম।

ও বলে, না না বাঘ ভাই, তোমাকে পিঠেই দেব। তুমি আমাকে খেও না।

বেশ, তাহলে কথা দিচ্ছ?

হ্যাঁ কথা দিচ্ছি।

তিন সত্যি!

তিন সত্যি

বেশ তাহলে নিয়ে যাও। কিন্তু কখন যাব আমি তোমার বাড়ি।

যখন দেখবে, অনেক অনেক ধোঁয়া উঠছে আমাদের বাড়ি থেকে তখনই যেয়ো। অল্প ধোঁয়া ওঠার সময় যেও না কিন্তু।

বাঘ হালুম করে বলে, আচ্ছা। কিন্তু কথাটা মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে না মানে, একশবার থাকবে।

তবে যাও। বাঘ তার বিরাট থাবা দুটো নামিয়ে আবার স্বাভাবিক

ভাবে চলে যায় বনে। সেও কাঠ নিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

সতীমতি বাই এবার ঢেঁকিতে চাল কুটে—গুঁড়ো করে গুড় দিয়ে গরম গরম পিঠে করতে থাকে। আর সে-ও সেই গরম গরম পিঠেই খেয়ে চলে একটার পর একটা।

খেতে খেতে পিঠে যখন শেষ, তখনই মনে পড়ে বাঘের কথা। আঁৎকে ওঠে সে—এবার কি হবে!

দিদি বলে, কিরে কি হল?

ও বলে সেই বাঘের কথা। বলে, এবার কি হবে সতীমতি বাই।

ভয়ে ততক্ষণ মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে দিদিরও। সেও বলে, তাইতো কি হবে? আর যে একটাও পিঠে নেই। তুই আগে বললি না কেন ভাই?

দূর ছাই, আমিও তো ভাবছি তাই। ভাই বোনে ভাবতে ভাবতে শেষে একটা বুদ্ধি বার করে। চুন দিয়ে তৈরি করে বেশ কয়েকটা পিঠে তারপর সেগুলি রেখে দেয় ঢেঁকি ঘরের বারন্দায়। ও বলে সতীমতি বাই, এই চুনের পিঠে খেয়ে বাঘ বাবাজি নির্ঘাৎ মরবে।, এইবার বেশ জোরে আগুন দাও।

ভাই বোনে চুনের পিঠে তৈরি করে রাখে ঢেঁকিঘরের বারান্দায়, আরও সব খোলা জায়গায়। তারপর বেশ করে লতাপাতার আগুন দেয়। জোর ধোঁয়া উঠতে থাকে তা থেকে। ওরাও দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ে চালের বিরাট জালার মধ্যে।

ধোঁয়া দেখেই বাঘ ভাবে, সময় হয়েছে পিঠে খাবার। প্রায় ছুটতে ছুটতেই আসে সে ওদের বাড়ি। ঢুকেই দেখে ঢেঁকি ঘরের সামনে রয়েছে একটা পিঠে। তাড়াতাড়ি কামড় দেয়। কিন্তু বিস্বাদ পিঠে

ফেলে দেয় থু থু করে। এবার দেখে বারান্দায় একটা। এদিক ওদিক আরো কয়েকটি। কিন্তু সে সব পিঠে খেয়ে জিভ পুড়ে যায় বাঘবাবাজির। যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করতে করতে বলে, আমাকে ঠকানোর মজা দেখাচ্ছি তোমাদের।

রাগে আর যন্ত্রণায় লেজ নাড়তে নাড়তে বাঘ এদিক ওদিক করতে থাকে। তারপর খোলা দরজা দেখে ঢুকে পড়ে ঘরে। খুঁজতে থাকে তাকে।

বাঘকে ঘরের মধ্যে দেখে জালার মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে দুই ভাই বোন।

ওদিকে ছেলেটার হয়েছে আরও মুশকিল। লোভে পড়ে তো প্রচণ্ড খাওয়া খেয়েছে। এখন সে পিঠে চাড় দিচ্ছে পেটে। ও ফিসফিসিয়ে বলে, আর যে পারছি না সতীমতি বাই—এখুনি যে পায়খানায় যেতে হবে আমাকে।

সতীমতি বাই বলে, একটু চুপ করে বোস। দেখছিস না ঘরে বাঘ।

আমি যে আর পারছি না বলেই প্রচণ্ড শব্দ করে পায়খানা করে ফেলে সে ওই জালার মধ্যেই। মাটির বদ্ধ জায়গায় সে শব্দ কয়েক-গুণ জোরালো হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে। বিদঘুটে সে আওয়াজে কিন্তু ভয় পেয়ে যায় বাঘ। কোন কিছু দেখতে না পেয়ে লেজ তুলে সে চম্পট দেয় সোজা জঙ্গলে।

তারপর ?

তার আর পর নেই। সতীমতি বাই আর তার ভাই বেঁচে গেল, গল্পটাও ফুরল ওইখানেই।

রাবণের ভাগ

লঙ্কার রাজা রাবণ। দুর্দান্ত তাঁর প্রতাপ। যাকে বলে বাঘে গরুতে জল খায় এক ঘাটেতে। রাবণ রাজার ইচ্ছের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই কারো। তাঁর কথাটি না শুনলেই মুণ্ডুটি যাবে কাটা, কিংবা পেতে হবে অন্য কোন কঠিন শাস্তি। এমনই তাঁর দাপট।

সেদিন সকালে রাবণ রাজা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছেন। একাই। খানিকটা গিয়ে রাবণ রাজা দেখেন, বুড়ো মতন একটা লোক বসে রয়েছে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে। লোকটাকে আগে কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না রাবণ রাজা। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কেননা, অসংখ্য তাঁর প্রজা। সবাইকে মনে রাখবেন তিনি কেমন করে? তাছাড়া লোকটার চেহারাও তেমন নজর কাড়ার মতো নয়। তবুও দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা রাবণ।

আসলে, লোকটার কাজটাই কেমন যেন একটু কৌতূহলী করে তুলেছে রাজা রাবণকে। লোকটা ছোট্ট একটা বাটিতে করে বালি নিচ্ছে তারপর রাখছে সেটাকে ডাইনে বাঁয়ে, অথবা সামনে পেছনে। লোকটার এই বিদঘুটে কাজের কোন অর্থ খুঁজে পান না রাবণ। পান না বলেই তাঁর দাঁড়িয়ে পড়া। লোকটার ওই কাজে মজা পান রাজা রাবণ আবার কৌতূহলও হয় দারুণ।

শেষ পর্যন্ত জয় হয় কৌতূহলেরই। রাজা রাবণ লোকটাকে না

ডেকে নিজেই গেলেন তার কাছে।

লোকটি এক মনে কাজ করে চলেছে। রাজা রাবণ যে দাঁড়িয়ে আছেন সেদিকে নজর পর্যন্ত নেই। বাধ্য হয়ে রাজা রাবণই বলেন, ওহে, তুমি লোকটা কে?

এতক্ষণে যেন খেয়াল হয় তার, তবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই লোকটা বলে, আমি বিধাতা। বিধাতা পুরুষ।

রাজা রাবণ একটু রসিকতা করেই বলেন তা বাবা বিধাতাপুরুষ, বুড়ো বয়সে সমুদ্রতীরে বসে বালি দিয়ে এ কী খেলা খেলছ?

খেলা নয়। প্রত্যেকের আজকের বরাদ্দ কত তাই মাপছি আমি।

প্রত্যেকের বরাদ্দ মাপছ?

হ্যাঁ।

প্রত্যেকেরই তাহলে বরাদ্দ আছে?

না। কারো কারো কপালে আজ কোনো বরাদ্দই নেই।

কৌতূহলী রাজা রাবণ বলেন, তা বাবা বিধাতাপুরুষ আমার আজকের বরাদ্দও মেপেছ?

হ্যাঁ।

তুমি বরাদ্দ না মাপলে কী হবে?

তার কপালে সেদিন তাহলে কিছুই জুটবে না।

কথাটা শুনে রাজা রাবণের পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল। তাই বলেন, তুমি বরাদ্দ না মাপলে আমারও কিছু জুটবে না?

না, আপনারও কিছু জুটবে না।

তুমি জান, আমি কে?

জানি, আপনি রাজা রাবণ।

এ কথায় একটু সময় চুপ করে থাকেন রাবণ রাজা। তারপর বলেন, বাবা বিধাতাপুরুষ, তুমি আমার ওই আজকের বরাদ্দটা তুলে নাও।

তা কি করে হবে ? একবার যা বরাদ্দ করা হয়েছে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না।

না যাক, আমার বরাদ্দ তোমাকে ফেরত নিতেই হবে।

সে হয় না মহারাজ।

হতেই হবে। যা বলছি তাই কর তুমি।

বরাদ্দ তোলা নিয়ে রাবণ রাজার সঙ্গে বিধাতাপুরুষের বেশ খানিকক্ষণ জেদাজেদি, তর্কাতর্কি হল। তারপর একরকম রেগেই বলেন বিধাতাপুরুষ, বেশ নিলুম তোমার বরাদ্দ তুলে।

বেশ এবার দেখব তোমার ক্ষমতা। তবে তুমি জেনে রাখ, তুমি বরাদ্দ না মাপলেও খাবার আমার জুটবেই, কেউ আটকাতে পারবে না।

রাবণ রাজার কথায় বিধাতাপুরুষ আর কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে টেড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে একবার বাজারটা ঘুরে যান রাবণ রাজা। বাজার থেকে বেশ বড় দেখে একটা রুই মাছের মাথা কিনে বাড়ি আসেন। মাথাটা রান্নাঘরে পাঠিয়ে দেন বেশ ভাল করে রান্না করার জন্য।

এরপর রাবণ রাজা গেলেন রাজসভায়। নিত্যকার কিছু কর্ম থাকে সেখানে। সে-সব সেরে বেশ খোসমেজাজেই ফেরেন বাড়ি। তারপর স্নান করে খেতে বসেন।

রাবণ রাজার খাওয়া—সে তো একটা যা তা ব্যাপার নয়—রীতিমত

ভোজ। পঞ্চ নয়, একেবারে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন সাজান রয়েছে পাতের চারিদিকে। আর সেই মাছের মাথাটার যা চেহারা হয়েছে না—আহা, দেখামাত্রই খানিকটা জল চলে আসে রাবণ রাজার জিবে।

খেতে বসে ওই মাছের মাথাটা দেখেই রাবণ রাজার মনে পড়ে যায় বিধাতাবুড়োর কথা। তাঁর আজকের বরাদ্দ নাকি তুলে নিয়েছে বুড়ো। তাঁর নাকি আজ খাবারই জুটবে না। তা এই যদি খাবার না জোটা হয় তাহলে অমন সে রোজই তুলে নিক।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই রাবণ রাজা হো-হো করে হেসে ওঠেন। সে হাসিতে মেতে যায় সবাই। রাণী মন্দোদরী দূর থেকে তদারক করছিলেন রাবণ রাজার খাওয়ার। তিনি কিন্তু রাবণ রাজার হাসি দেখে রীতিমত রেগে যান। তাঁর মনে হয় খাবার পছন্দ হয়নি বলেই রাবণ রাজা হাসছেন। আর তাতেই মাথায় রক্ত চড়ে যায় মন্দোদরীর।

মন্দোদরী রীতিমত মেজাজ নিয়ে বলেন, না হয় খাবার পছন্দই হয়নি—তা বলে হাসার কি আছে? জানো আজ আমি রাঁধতে পারিনি। রেঁধেছে তোমার ভাই বিভীষণের বৌ সরমা। সে বেচারা না হয় ভাল রাঁধতে পারে না—তা বলে এমন করে হেসে অপমান করতে হবে?

মন্দোদরীর কথার সামনে রাবণ রাজা প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যান। কিন্তু সেটা ওই একটুক্ষণের জন্যই। তারপরই তাঁর মেজাজটাও চড়ে যায়। তিনি রাবণ রাজা আর তাঁকে কিনা না-হক কিছু কথা শুনিয়ে দেওয়া। রাবণরাজাও তাই তেড়ে ঝগড়া শুরু করেন মন্দোদরীর সঙ্গে।

ঝগড়ায় মন্দোদরীও কম যান না। এক কথা দু'কথায় বেড়েই গেল

ঝগড়া। রাগের চোটে খাবার থালা উল্টে দিয়ে উঠে গেলেন রাবণ রাজা সোজা বারমহলে।

তখনও পুরো বিকেল হয়নি। রাবণ রাজার রাগটা তখন পড়ে এসেছে। দুপুরে না খাওয়ার জন্য পেটটা একটু চিন চিন করছে। আর তখনই মনে পড়ে গেল বিধাতা পুরুষের কথা। রাবণ রাজা তাড়াতাড়ি ছুটলেন সমুদ্রের তীরে।

গিয়ে দেখেন বিধাতাপুরুষ তখনও রয়েছেন সেখানে। এবার বেশ বিনীতভাবেই রাবণ রাজা বললেন, হ্যাঁ বিধাতাপুরুষ আপনি ঠিক বলে-ছিলেন—আজ দুপুরে আমার খাওয়া হয়নি। সত্যিই আপনার ক্ষমতা আছে।

রাবণ রাজার সে কথাতেও বিধাতাপুরুষ শুধুই হাসেন আর নিজের কাজ করে যান।

সেই থেকেই কেউ যেটা পাবে বলে একেবারে নিশ্চিত, অকারণেই যখন সেটা থেকে বঞ্চিত হয় তখন লোকে বলে ওটা রাবণ রাজার ভাগ।

বাঘের বউ

বুড়ো বামুন ফিরছিল ঘরে। সন্থ একটা বিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে বিয়ের নানা পাওনা-পত্তর। মনটা তার তাই ভারি খুশি খুশি।

ঘরে ফিরতে বামুনের পার হতে হয় একটা জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝ বরাবর এসে বামুনের আক্কেল গুড়ুম। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কেঁদো বাঘ। বাঘ দেখে বামুন কাঁপছে তখন থরথর করে। সে ধরেই নিয়েছে বাঘের হাতেই রয়েছে তার মরণ।

বাঘ কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে না বামুনের ওপর। বরং একটু মিষ্টি গলাতেই বলে, ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা বলি গেছলে কোথায়?

বামুন কোনরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, আর বল কেন, গেছলুম বিয়ে দিয়ে একজন নারী আর পুরুষকে এক করতে।

বিয়ে হলে কী হয়?

বাঘের কৌতূহল মেটাতে বামুন বলে, বিয়ে হলে আর কী হবে, তারা বর বউ হয়ে গেল।

কথাটা শুনে বাঘের চোখ একটু জুলুজুলু হয়ে ওঠে। মুখটা যতটা সম্ভব করুণ করে বলে, ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা, আমি একদম একা একা থাকি। তুমি আমার জন্যও একটা বউয়ের ব্যবস্থা করে দাও।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বামুন বলে, ঠিক আছে বাছা, আমি চেষ্টা করব এখন, তোমার জন্য একটা বউয়ের।

না, না, চেষ্টা নয় ঠাকুর্দা, তোমাকে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

বামুন যত বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি দেখছি কী করতে পারি। বাঘ তত বলে, চেষ্টা নয়, ব্যবস্থা করতেই হবে। আমার একটা বউ তোমাকে জোগাড় করে দিতেই হবে।

বামুন ঠিক আছে বলে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। বাঘ কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়ে না। একদম বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। মুখে তার এক কথা, আমার একটা বউ ঠিক করে দিতেই হবে তোমাকে।

বাড়ি এসেই বামুন তার বৌকে বলে দরজা খুলতে। তারপর নিজে ঢুকেই চট করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। বাঘটা তখন বাইরে থেকেই চিৎকার করে বলে, ঠাকুর্দা, আমি তাহলে কবে আসব আমার বউয়ের জন্য ?

ভেতর থেকে বামুন বলে, কয়েকদিন পরে, ধর এই মঙ্গলবারে এসো।

বামুনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে বাঘ চলে যায় আবার বনে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে বামুনও।

দেখতে দেখতে এসে যায় মঙ্গলবার। বামুন বাঘের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎই দেখে সেই বাঘ আসছে। দেখেই দরজা বন্ধ করে কাথা চাপা দেয় বামুন। বুড়ি বামনীকে বলে, বাঘকে বোলো, আমার দারুণ অসুখ, সে যেন পরে আসে।

ততক্ষণে এসে গেছে বাঘ। বাইরে থেকে হাঁক মারে, ঠাকুর্দা, ও ঠাকুর্দা।

বুড়ি বামনী ভেতর থেকেই বলে, আর বলো কেন বাছা। তোমার বুড়ো ঠাকুর্দাটি অসুখে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে সে কাতরাচ্ছে। তুমি বরং অন্যদিন এসো।

বাঘ বলে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি ঠাকুর্দার জন্য একটা হরিণ মেরে এনেছিলাম। সেটা কোথায় রাখব?

ওই বারান্দায় রেখে যাও, আমি গিয়ে নেব এখন। বাঘ তাই করে। হরিণটাকে বারান্দায় রেখে চলে যায়। বলে, সে আবার আসবে। বুড়ি বলে, হ্যাঁ, আবার মঙ্গলবারেই এসো এখন।

বাঘ চলে যেতেই উঠে পড়ে বামুন। বাইরে এসে দেখে বিরাট একটা হরিণ রেখে গেছে বাঘ। সেই হরিণের মাংস দিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের একটা বিরাট ভোজ দিল বামুন।

সবাই হরিণের মাংস খেয়ে দারুণ খুশি। বামুনের কিন্তু বুক দুরুদুরু। ভয়, আবার আসবে বাঘ, তখন কী হবে?

বামুন তার প্রতিবেশীদের বলে, দেখ, তোমরা বেতের তৈরি বীজ রাখার একটা মড়াই এনে রেখ। তারপর ওইদিন আমি যেমন বলব, তেমন করবে, কেমন। পাড়া প্রতিবেশীরা মাথা নেড়ে চলে যায়।

আসে মঙ্গলবার। বাঘ আবার হাজির। সঙ্গে ভেট হিসেবে আবার মেরে নিয়ে এসেছে একটা হরিণ। তাকে দেখে বামুন দারুণ খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে বলে, বাছা তুমি ঠিক দিনেই এসেছ। নির্ঘাৎ তুমি বউ পাবে।

বামুনের কথায় খুশি বাঘ হরিণটাকে রেখে সটান একটা পেন্নাম করে বামুনকে।

বামুন বলে, তা বাছা বিয়ের আগে যে কতকগুলো অনুষ্ঠান আছে। সেগুলো না করলে যে বউ পাওয়া যায় না।

বাঘ বলে, আপনি যা বলবেন তাই করব আমি। কিন্তু বউ আমার চাই-ই। বলুন কী করতে হবে।

বামুন বলে, দেখ, অধিবাস না হলে বিয়ে হয় না। আগে তোমার অধিবাস করা দরকার।

তবে তাই করুন ঠাকুর্দা।

বেশ, তবে এক কাজ কর, এই বেতের মড়াইটায় ঢুকে পড়।

বামুনের কথায় ঝুপ করে বেতের মড়াইতে ঢুকে পড়ে বাঘ। সঙ্গে সঙ্গে বামুনের ইশারা পেয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা বন্ধ করে দেয় মড়াইয়ের ঢাকনা—বাঁধতে থাকে তাকে কষে দড়ি দিয়ে।

বামুন কিন্তু মাঝে মাঝেই হেঁকে যায় ভয় পেয়োনা বাছা, এসব অধিবাসের তোড়জোড়। এবারই শুরু হবে আসল তোড়জোড়।

ওদিকে প্রতিবেশীরা মড়াইটাকে বেশ করে বেঁধে এবার মুগুর পেটাই করতে থাকে। যন্ত্রণায় বাঘ চিৎকার করতে থাকে। বামুন কিন্তু বলে, চেঁচাতে নেই বাছা। এটা অধিবাস। ঠিকমত অধিবাস হলেই তুমি বউ পেয়ে যাবে।

বউ পাওয়ার আশায় মুখ বুজে বাঘ সহ্য করে ওই পেটানি। মারের চোটে তার চোখ ফেটে জল বেরোয়, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না এতটুকু।

মুগুরের অত পেটানি খেয়ে বাঘ একসময় জ্ঞান হারায়। লোকজন কিন্তু মনে করে সে মরে গেছে। তাই মড়াই সুদ্ধ তাকে টেনে নিয়ে ফেলে দেয় নদীর জলে

বেতের মড়াইয়ের মধ্যে বাঘ ভাসতে থাকে নদীতে। ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায় সে। জলের ছোঁয়া পেয়ে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে বউ পিত্যেশী বাঘের।

ওদিকে নেহাতই আচমকাভাবে নদীর ওই দিকটাতেই এসে হাজির

হয় এক বাঘিনী। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। সারাদিন চেষ্টা করে একটা শিকারেরও নাগাল পায়নি সে। তাই এসেছে নদীর ধারে যদি জলে ভাসা কিছু পাওয়া যায়—নিদেনপক্ষে কিছু মাছ।

এমন সময় চকচক করে ওঠে তার দুটো চোখ। ওই তো, কি একটা যেন ভেসে আসছে। এতক্ষণে খাবার পাওয়া যাবে ভেবে সে আনন্দে আড়মোড়া ভাঙে একবার, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। সাঁতরে যায় সেই মড়াইটার কাছে।

মড়াইটাকে টেনে মাটিতে তুলে বাঁধন খুলতেই অবাক কাণ্ড। খাবার কোথায় এ যে বাঘ। তরতাজা জোয়ান মদ্দ একটা বাঘ। আর বাঘও সেই মড়াই থেকে বেরিয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে তরুণী সুন্দরী এক বাঘিনী। বাঘ ভাবে সেই বুড়ো বামুনই তার জন্য মিলিয়ে দিয়েছে এমন সুন্দরী এক বউ। আহ্লাদে সে গরগর করে আদর করে বাঘিনীকে। বাঘিনীও একা। তাই এমন তাজা বাঘ পেয়ে চুপটি মেরে মিঁউমিঁউ করে আদর করে।

বাঘ বলে বাঘিনীকে, বুড়ো ঠাকুর্দা বড় ভাল। তার জন্যই তারা দুজনে আজ মিলতে পারল। তাই শ্রদ্ধা জানানো উচিত সেই বামুনকে।

কিন্তু কেমন করে শ্রদ্ধা জানাবে তারা। তারা তো মানুষ নয়, বাঘ। তাই দুজনে মিলে জঙ্গলে গিয়ে মারল মস্ত একটা হরিণ। সেই হরিণ কাঁধে নিয়েই তারা চলল সেই বামুনের বাড়ি।

দূর থেকে বাঘকে আসতে দেখেই তো বামুনের আত্মারাম খাঁচাছাড়া। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে তার হাত পা। সে ভাবে আজ হয়ে গেল, বাঘের হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোনো রাস্তাই

নেই তার সামনে। তবু দরজা বন্ধ করে বসে থাকে সে।

বাঘ আর বাঘিনী এসে গেছে ততক্ষণে। বাঘ হেঁকে বলে, ঠাকুর্দা, আপনি যে আমার বউ জুটিয়ে দিয়েছেন তাতে আমি খুশি। আমরা জোড়ে প্রণাম জানাতে এসেছি আপনাকে। তাছাড়া আমরা আপনার জন্য একটা হরিণও এনেছি।

বাঘের কথা শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে বামুনের। কিন্তু পুরো সন্দেহ যায় না, যায় না ভয়ও। তাই ঘর থেকেই বলে, বাছা, শরীরটা ভাল নেই বিশেষ। তোমরা ওই বারন্দায় রেখে যাও হরিণটা। তোমরা ওখান থেকেই পেন্নাম কর, আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ কবছি তোমাদের।

বাঘ আর বাঘিনী তাই দরজার বাইরে থেকেই প্রণাম করে বামুনকে। তারপর কৃতজ্ঞতায় গরগর করতে করতে বাঘ চলে যায় বনে তার বাঘিনীকে নিয়ে।

ভাই ভাই এক ঠাঁই

ওরা দু'টি ভাই। থাকত এক ঠাঁই। কোনো ব্যাপারেই ওদের অমিল ছিল না এতটুকু। মারা যাবার সময় ওদের বাবা যা রেখে গিয়েছিল তাতেই দিন কাটছিল ওদের সুখে।

ওদের ওই সুখে কিন্তু চোখ টাটাচ্ছিল গ্রামের এক শয়তান বুড়োর। সে বুঝে পায় না কোন্ সুখেতে ওরা একসঙ্গে আছে। ওদের আলাদা দেখতে না পেলে যেন পেটের ভাত হজম হবে না বুড়োর।

তাই একদিন বড় ভাইকে ডেকে বলে বুড়ো, কি ব্যাপার বলতো, সব ভাইরা আলাদা আলাদা থাকে, আর তোমরা দু'টিতে দিব্যি একসঙ্গে আছ ?

কী করব বলুন, ছোট ভাইটি আমার একটু বোকা, কিন্তু দারুণ ভাল। আমার খুব বাধ্যও। ওকে আলাদা করব কী করে ?

কেন, তোমার বাবা মারা যাবার সময় কী সম্পত্তি রেখে গেছেন ?

একটা গরু, সুপুরি গাছ আর একটা কম্বল।

মাত্র। তাহলে এই তিনটে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও, তাহলেই আলাদা হয়ে যাবে ?

কেমন করে এগুলো ভাগ করব দুজনের মধ্যে।

তোমার ভাইতো তোমার খুব বাধ্য বললে ? আবার একটু বোকাও ?

বুড়োর কথায় মাথা নেড়ে বলে বড় ভাই, হ্যাঁ, তাই বটে।

তবে এক কাজ কর, সুপুরি গাছের মাথার দিকটা নাও তুমি আর গোড়ার দিকটা দাও ভাইকে। আবার গরুর সামনের দিকটা দাও ভাইকে তুমি নাও পেছন দিকটা। আর কম্বলটা সারা দিন থাকুক তোমার ভাইয়ের কাছে আর রাত্রে নাও তুমি।

বুড়োর এই ভাগাভাগির মতলবটা বড় ভাইয়ের ভালই লাগে। তাই বাড়ি গিয়ে ছোট ভাইকে বলে, শোন আজ থেকে আমরা আলাদা হয়ে থাকব। তুই কী বলিস।

ছোট ভাই বলে, বেশ তো তুমি যেটা করা দরকার তাই কর। ওতে আর আমার মত নেওয়ার কী আছে?

না, তবু জেনে রাখ, এখন থেকে গরুটার সামনের দিক তোর। তুই-ই গরুকে খাওয়াবি আর পেছনের দিকটা আমার। আমি গোবর-টোবর পরিষ্কার করব দুধ দোয়াব—এইসব আর কি। সুপুরি গাছটার সামনে মানে ডগার দিকটা আমার থাকবে তোর থাকবে গোড়ার দিক। তেমনি কম্বলটা দিনের বেলায় নিস তুই, আমাকে দিস রাত্রে।

ছোট ভাই বলে, অত জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। তুমি যেটা ভাল বুঝবে সেটাই হবে।

তা, তাই হল। সম্পত্তি ভাগ করে দুভাই আলাদা আলাদা থাকতে লাগল।

ছোট ভাই গরুকে খাওয়ায়, দুধটা নেয় দাদা।

সুপুরি গাছের যত্নআত্তি করে সে, সুপুরি পায় দাদা, কম্বলটাও রাতের বেলা নেয় দাদা, সে পায় দিনে। ফলে রাতের বেলা দাদা ঘুম দেয় বেশ আরামে আর ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপে ছোট ভাই।

এমনি ভাবে চলে দিন। সেদিন গাছতলায় কম্বল জড়িয়ে বসে বসে ঢুলছে ছোট ভাই। একজন ভিখিরি তাকে ওভাবে ঢুলতে দেখে বলে, এই দিন দুপুরে বসে ঢুলছ কেন?

তন্দ্রা ভেঙে ছোট ভাই বলে, আর বল কেন, ঠাণ্ডায় রাতের বেলা ঘুমোতেই পারি না। আগুন জেলে বসে থাকি সারারাত। তাই রোদ পোয়াতে পোয়াতে একটু ঢুলছি।

কেন কম্বলে শীত মানে না?

আহা, কম্বলটা তো রাতের বেলা দাদার। আমি তো দিনের বেলা এর মালিক।

মানে?

ছোট ভাই তখন তাদের সম্পত্তি ভাগাভাগির সব কথাই বলে।

শুনে ভিখিরিটির খুব দুঃখ হয়। বোকা সরল ছোট ভাইকে এমন করে ঠকাচ্ছে বলে বড় ভাইয়ের ওপর তার একটু রাগও হয়। তাকে জব্দ করার জন্য তাই বলে, তোমার দাদা যখন গরুর দুধ দোয়াবে তখন তুমি গরুটাকে সামনের দিকে কষে মার লাগাবে। দাদা কিছু বললে বলবে, গরুর সামনের দিক আমার, আমি যা খুশি তাই করব।

কম্বলটাকেও সন্ধের একটু আগে বেশ করে জলে ভিজিয়ে শুকোতে দেবে। কিছু বললে একই কথা বলবে। দিনের বেলা তো এটা আমার। এখন তো আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

আর তোমার দাদা যখন সুপুরি গাছে উঠবে সুপুরি পাড়বার জন্য, তখন তুমি কুড়ুল দিয়ে গাছের গোড়ার দিকে কোপ মারবে। দাদা জিজ্ঞেস করলে বলবে, গাছের গোড়া আমার, আমি সেটা কেটে ফেলব। দেখবে এরকম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভিখিরির কথা ছোট ভাইয়ের বেশ মনে ধরে। সে ভিখিরির কথামত কাজ শুরু করে দেয়।

দাদা যেই দুধ দোয়াতে শুরু করেছে ও তখনি গরুটাকে সামনের দিকে মারতে থাকে। গরুটা লাফাতে থাকে তিড়িং তিড়িং করে। দুধ আর দোয়ান হয় না। বড় ভাই চিৎকার করে বলে, এই হচ্ছেটা কী?

ভিখিরির শেখান কথাগুলিই বলে ছোট ভাই। বড় ভাই বলে, দোহাই তোর, তুই থাম। এখন থেকে গরুর দুধ আমরা ভাগ করে নেব দুজনেই।

সন্ধের একটু আগেই কম্বলটাকে বেশ করে জলে ভিজিয়ে জবজবে করে তা টাঙিয়ে দেয় উঠোনে। তা দেখে বড় ভাই বলে, এটা কী করলি?

কিছু না, কম্বলটা খুব ময়লা হয়েছিল, তাই ধুয়ে দিলাম। তাছাড়া দিনের বেলাতো এটা আমার। এটা নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

সে রাতে শীতে আর ঘুম হল না বড় ভাইয়ের। সে বুঝতে পারল ছোট ভাইয়ের কষ্ট। তাই বলল, না ভাই, আজ থেকে রাতে আমরা দুজনেই এই কম্বল গায়ে দিয়ে শোব।

এর দিন দুই বাদে, বড় ভাই উঠেছে সুপুরি গাছে। ছোট ভাই অমনি কুড়ুল দিয়ে কোপ মারে গোড়ায়। বড় ভাই চিৎকার করে ওঠে, এই, এই করছিসটা কী?

কেন, গাছের গোড়ার দিকটা তো আমার। আমি এখন গোড়ার দিকটা কেটে ফেলব।

বড় ভাই তাড়াতাড়ি নেমে আসে নিচে। বলে ওরে বুদ্ধু, তুই যে গোড়া কাটছিস, ওতে যে গাছটাই মরে যাবে।

বা রে আমার ভাগ নিয়ে আমি আমার খুশিমত কিছু করতে পারব না?

বড় ভাই বলে, না। আর আমাদের ওই ভাগাভাগিতে দরকার নেই। আবার আমরা সেই আগের মত একসঙ্গেই থাকব। আবার সবকিছু আগের মত দুজনেরই।

দাদার কথায় ছোট ভাইয়ের দারুণ আনন্দ। আবার তারা এক-সঙ্গেই থাকে। তাদের সুখ দেখে সেই শয়তানবুড়ো আবার জ্বলতে থাকে আগের মতই। আর কোনদিন কিন্তু দুভাই ভোলেনি ওই বুড়োর কথায়।

বাঘ মামার ভাগ্নে শেয়াল

পাঁচমুড়ো পাহাড়ের কোণে ওই যে ঘন জঙ্গল, তাতে থাকত একটা বাঘ আর শেয়াল। সেটা অবশ্য অনেকদিন আগেব কথা। তা বাঘ হল শেয়ালের মামা।

তা একদিন বাঘ মামা হাঁক দিল, ভাগ্নে, বলি তোমার ব্যাপাবটা কি? এভাবে বসে বসে সময় নষ্ট কবছ কেন?

মাথা চুলকে ভাগ্নে শেয়াল বলে কি করব মামা, করব যে তেমন কোনো কাজও নেই হাতে। তাই তো ঘুমিয়ে দিন কাটাই।

ভাল নয়, ভাল নয়। বাঘমামা বারকয়েক ঘাড় নেড়ে কথাটা বলে। বলে, জোয়ান বয়সেই যদি ঘুমিয়ে কাটাও তাহলে বুড়ো বয়সে কববে কি? না, না, কাজ কর, কাজ কর।

করার কিছু নেই যে।

নেই তো কি হয়েছে, যা হোক, একটা কিছু কর।

বাঘের এই গম্ভীর উপদেশ শুনে চোখ মটকে শেয়াল বলে, তাহলে তুমিই বলে দাও মামা, আমি কি করব?

আমি বলে দেব? বেশ, আর কিছু করতে না পার, একটু চাষবাস তো করতে পার, তাতে দু'টো ফসল হয়, দু জনের একটু সুরাহা হয় তাহলে।

কিন্তু মামা, জমি কোথায়? চাষের হাল বলদ কই? চাষটা

হবে কী করে ?

সে ভাবতে হবে না তোমাকে, কালই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল থেকেই লেগে পড় চাষে।

বাঘের ফাঁদে পড়ল শেয়াল। সত্যি সত্যি সব ব্যবস্থা করে দিল বাঘ। অগত্যা শেয়াল শুরু করল চাষ—ধানের।

মাস কয়েক পরের কথা। সোনালি ধানে ভরে উঠল মাঠ। সেই ধানের ক্ষেতে দোলা দিয়ে যায় হাওয়া। দেখে আনন্দে গান গেয়ে ওঠে শেয়াল—হুক্কা-হুয়া হুক্কা-হুয়া।

শেয়ালের গান শুনে দূর থেকেই বাঘমামা বোঝে ফসলটা ফলেছে ভাল। তাই আর দেরি না করে চলে আসে ক্ষেতের কাছে।

বাঘকে দেখেই শেয়াল বলে, দেখ, দেখ মামা, কেমন ফসল ফলেছে ?

বাঘ গম্ভীর মুখে শুধু বলে, হুম। শেয়াল বুঝতে পারে না বাঘ অত গম্ভীর কেন ? তবু বলে, তা মামা, এবার তো ফসল কাটার সময় হল।

বাঘ আবারও বলে, হুম।

শেয়াল এবার একটু ঘাবড়েই যায়। তবু মাথা চুলকে বলে, তা মামা ভাগটা কেমন হবে ? তুমি পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেবে তো ?

বাঘের মুখে সেই এক আওয়াজ, হুম।

তবে কি অর্ধেক ?

না।

তবে ?

অমন করে ভাগ হবে না। আমি নেব ফসলের ওপরের দিকটা

আর তুমি নেবে নিচের দিকটা।

বাঘ মামার ভাগের বহর শুনে শেয়ালের চোখে প্রায় জল এসে যায়। এত খেটেখুটে সে পাবে কিনা শুধু ধান গাছের গোড়া। তাই একটু করুণ ভাবেই বলে কিন্তু মামা, নিচের দিকে যে শুধু খড়।

হোক, ওই চিবুবে তুমি বসে বসে।

বেচারা শেয়াল, কি আর করে ? বাঘের সঙ্গে তো সে পারবে না, তাই বাঘের ভাগই মেনে নিতে বাধ্য হয়। ধানের বদলে খড় চিবিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাকে।

পরের বছর আবার আসে চাষের সময়। বাঘ এসে বলে, ভাগ্নে, চাষে লেগে পড়।

ব্যাজার মুখে শেয়াল বলে, না মামা, আমি আর চাষ করব না। খেটেখুটে চাষ করব আমি, আর তুমি ফসল যা দেবে। না থাক, এবার চাষ বন্ধ থাক।

বাঘ বলে, বেশ তো এবার না হয় চাষের আগেই ভাগ ঠিক করে নেওয়া যাবে।

শেয়াল বলে, তাহলে এবার তুমি ফসলের ওই মাথার দিকটাই নেবে, আমি নেব গোড়ার দিকটা।

বাঘ এক কথাতেই রাজি। শেয়াল শুরু করে চাষ। তবে এবার আর সে ধান বোনে না, এবার সে লাগায় আখ। কিছুদিন বাদে বেশ ভাল আখ হয় জমিতে। একসময় আখ কাটারও সময় হয়। বাঘও আসে।

চুক্তিমত শেয়াল আখের ডগার দিকের পাতাগুলো দেয় বাঘকে আর নিজে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে খায় রসাল আখ। ওদিকে আখের

পাতা খেতে গিয়ে কেটে যায় বাঘের মুখ। রাগে সে গরগর করতে থাকে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না, আগেই চুক্তি হয়েছে বলে।

পরের বার চাষের সময় বাঘ এসে বলে, দেখ ভাগ্নে গতবার তুমি আমাকে বড্ড ঠকান ঠকিয়েছ। এবার আর ওসব চলবে না। এবার আমি গাছের ডগা গোড়া সব নেব, তুমি নেবে শুধু শেকড়গুলো।

এ চুক্তিতেও রাজি হয়ে যায় শিয়াল। তবে বারবার সে বলে, পরে কিন্তু এ নিয়ে আমাকে আর কিছু বলতে পারবে না।

বাঘ বলে, না, না। কথা, কথা। তুমি চাষ কর, আমি ফের আসব ফসল কাটার সময়।

শেয়াল চাষ করে। ফসল কাটার সময় হয়। বাঘ আসে, চুক্তিমত ফসলের গোড়া, আগা সব নেয় বাঘ। আর শেয়াল পায় মাটির নিচের শেকড়বাকড়। কিন্তু তাই নিয়েই শেয়াল বেশ মনের আনন্দে খেতে থাকে আর বাঘ সেইসব আগাডগায় হয় নাকালের একশেষ।

ব্যাপার হয়েছে কি, শেয়াল এবার চাষ করেছিল মিষ্টি আলুর। তাই বাঘ পেয়েছে শুধু লতাপাতা আর শেয়াল মাটির নিচের আলু। সেই আলু খেতে খেতে শেয়াল যখন গান ধরতে যাবে সে সময়ই রাগে দিশেহারা বাঘ তাকে করে তাড়া।

বাঘকে তাড়া করতে দেখেই শেয়াল লাগায় ছুট। ফেউ-ফেউ-ফিক করে কাঁদতে কাঁদতে শেয়াল ছোটে—পেছনে তাড়া করে বাঘ।

সেদিন থেকেই বাঘ দেখলেই শেয়াল কান্না জোরে ফেউ-ফেউ-ফিক—জানান দেয় সবাইকে বাঘ আসার কথা। সেদিন থেকেই শেয়ালের আরেক নাম হয় ফেউ।

বুড়ো মস্ত গুণিন

সে অনেককাল আগের কথা। জায়গাটা যে কোথায়, তা ঠিক বলা শক্ত। তবে ছিল একটা গ্রাম। সে গ্রামে ছিল এক বুড়ো। বুড়োর আপনার বলতে কেউ ছিল না, বুড়ি বউটা ছাড়া। তাই বুড়ো করত চাষবাস, বুড়ি করত ঘরকন্নার কাজ।

দিন তাদের চলে যাচ্ছিল কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে। বেশি সুখ না পাওয়ায় মনে তাদের ছিল না এতটুকু দুঃখু। তাই বোধহয় একদিন তাদের বরাত ফিরল।

তা সেই বরাত ফেরার শুরু থেকেই শুরু করা যাক গল্পটা। উঁহু, গল্প নয়, একেবারে সত্যি কথা। তা সত্যি হোক, আর মিথ্যেই হোক, হয়েছিল এটা।

বুড়োর ঘরের ঠিক পেছনেই চাষের জমি। সকাল হতেই হাল লাঙল নিয়ে বুড়ো গেছে মাঠে। বুড়ি করছে ঘরের কাজ। কাজ করতে করতে বেলা যায়। খিধেটাও একটু চনচন করে ওঠে। আর সেই সময়ই জাগল ইচ্ছেটা।

না, বুড়োর নয়, বুড়ির। খুউব পিঠে খেতে ইচ্ছে করল তার। এখন ইচ্ছে করলেই তো হবে না, তার জোগাড়যন্ত্র তো করতে হবে। বুড়ি চারটি ধান নিয়ে ঢুকল ঢেঁকি ঘরে। একাই কোনোরকমে চাল কুটে তাকে গুড়ো করল।

তারপর সেই চালের গুড়ো আর গুড় মিশিয়ে বেশ করে গুলে নিল বুড়ি। এবার কাঠের উনুনে তাওয়া চাপিয়ে যেই দিয়েছে একহাতা গোলা অমনি হয়েছে ছ্যাক্ করে মস্ত শব্দ।

হাল চষতে চষতেই বুড়োর কানে গেল সে শব্দ। হাল বলদ ফেলেই বুড়ো একবার উঁকি মেরে দেখল বুড়ি কি করছে।

বুড়ি আপন মনে পিঠে করছে। যতবার সেই গোলা দিচ্ছে তাওয়ায় আওয়াজ হচ্ছে ছ্যাক করে আর বুড়ো তখনি গুনছে। এক, দুই, তিন করে করে যখন বারো হল তখনই আওয়াজ গেল একবারে থেমে। বুড়ো বুঝল পিঠে হয়েছে শেষ। তাই সেও হাল চষা সেখানেই করল শেষ। চলে এল বাড়িতে।

বুড়ো আসতেই বুড়ি এগিয়ে দেয় হাত মুখ ধোবার জল—দেয় গামছা। বেশ আয়েস করে মুখ মুছতে মুছতে বুড়ো বলে, আজ বুঝি পিঠে করেছ ?

বুড়ি অবাক। বুড়ো বুঝল কি করে ? বুড়ি তাই জিজ্ঞেস করে, তুমি জানলে কী করে ?

বুড়ো হাসে। বলে, বারোটা পিঠে করেছ বুঝি ? বুড়ি আরো অবাক। বলে, ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

বুড়ো বলে, পারি, পারি, আমি সবই জানতে পারি। এ কথায় বুড়ি ভাবে, বুড়ো নিঘ্‌ঘাৎ গুনতে জানে ? বলতে পারে কোথায় কি আছে। বুড়োর এই নতুন গুণের কথা জেনে বুড়ির আর আনন্দের শেষ নেই। সে পাড়া প্রতিবেশী যাকেই পায় তাকেই বলে, বুড়ো আমার মস্ত গুণিন। সব বলে দিতে পারে সে। তার আছে অলৌকিক ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার বলেই ঘরে না থেকেও সে বলে

দিয়েছে, পিঠে হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঠিক ক'খানা পিঠে হয়েছে তাও বলে দিয়েছে সে। তার মতো গুণিন নেই আর এ রাজ্যে।

কথাগুলো যখন বুড়োর কানে আসে তখন তার ভালই লাগে। বুড়িকে সে একটু আদরও করে দেয়।

এরই মধ্যে রাজার ঘোড়াটা গেল হারিয়ে। রাজার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়া। তাই চারদিকে খোঁজ পড়ে যায়। কিন্তু ঘোড়া দূরে থাক তার লেজের সন্ধানও পায় না কেউ।

ওদিকে বুড়ো যে মস্ত গুণিন একথা তো চারধার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা রাজ্যে। তাই একজন বলে, মহারাজ, ওই গাঁয়ে এক বুড়ো আছে। সে নাকি মস্ত গুণিন। সে নাকি মাঠ থেকেই বলে দিয়েছে তার বউ ক'খানা পিঠে করেছে। তাকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না?

রাজা বলে, বেশ তো। ডাকো তাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সেপাই। ছুটল পেয়াদা। বুড়োকে বলে, চল এখুনি, রাজামশাই ডাকছে।

রাজা ডাকছে শুনেই বুড়ো তো কেঁপে একশা। পেয়াদারা অবশ্য বলে, ভয় নেই। রাজা মশাইয়ের পেয়ারের ঘোড়াটা গেছে হারিয়ে। সেইটে খুঁজে দিতে হবে তোমাকে। মিলবে অনেক পুরস্কার।

আর পুরস্কার। বুড়ো ভাবে বুড়ির ওই প্রচারের জন্য এবার বুঝি প্রাণটাই গেল তার। তাই বুড়িকে বলে, বুড়িরে আমি চললাম। আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না।

কথাটা শুনেই ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বুড়ি। বুড়ো তাকায় না আর সেদিকে। পেয়াদার সঙ্গে চলে রাজার বাড়ি। চলতে চলতে নদীর ধারে এসে বুড়ো বলে পেয়াদাকে—ইয়ে, আমার বড় পায়খানা

পেয়েছে। তুমি দাঁড়াও একটু, আমি ওই নদীর পাড়ে সেরে নিচ্ছি।

পেয়াদা দাঁড়ায়। বুড়ো নামে নিচে নদীর পাড়ে। আর তখনই তার চক্ষু চড়কগাছ। আরে ওই তো রাজার ঘোড়া। দিব্যি চরে বেড়াচ্ছে নদীর পাড়ে ঘাসবনের মধ্যে।

ঘোড়া দেখেই বুড়ো উঠে আসে ঝটপট। তারপর পেয়াদার সঙ্গে যায় রাজার কাছে। সেখানে গিয়ে একটু তিড়িং বিড়িং ভড়ং করে বলে, রাজামশাইয়ের ঘোড়া আছে নদীর ধারে অমুক জায়গায় ঘাসবনের মধ্যে। বেশ মেজাজে চিবুচ্ছে সে কচি কচি সবুজ ঘাস!

সঙ্গে সঙ্গে ছোটে পেয়াদা। দেখে সত্যিই তাই। রাজার ঘোড়া খাচ্ছে ঘাস। পাকড়াও করে ঘোড়া নিয়ে আসে তারা। খুশি রাজা অনেক পুরস্কার দেন বুড়োকে। বুড়োর কপাল ফেরে, নামও ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

ক'দিন পরেই আবার অঘটন। এবার হার চুরি। রাণীর সাতভরি হারটা যাচ্ছে না পাওয়া। আবার তলব রাজবাড়িতে। বুড়ো ভাবে, একবার হঠাৎ করে তো পেয়েছি রেহাই। এবার নির্ঘাৎ প্রাণটা যাবে। কিন্তু ভেবে তো লাভ নেই। তাই সে এল রাজবাড়িতে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাজাকে একটা পেন্নাম করে বুড়ো বলে, রাজামশাই, এ বড় কঠিন কাজ। তা আজ রাতটা যাক। কাল আমি বলে দেব কোথায় আছে হার।

রাজবাড়িতেই থাকার জায়গা হয় বুড়োর। ভারি খাতির করে খাওয়ান হয় তাকে। শুতে দেওয়া হয় বেশ ভাল খাটে ভাল বিছানায়। কিন্তু বুড়োর ঘুম আর আসে না। আসলে ভয়েই তার প্রাণ যে ঠেকেছে গলায়। তাই শুয়ে শুয়ে বুড়ো বলে, নিদ্রাণী গো, নিদ্রাণী

এখনও তুমি আসছ না কেন ? একবার নয়, বেশ কয়েকবার বলে বুড়ো।

এদিকে হয়েছে কি, নিদ্রাণী বলে রাণীর ছিল এক দাসী। সেই চুরি করেছিল হারটা। সে ছিল পাশের ঘরেই। বুড়োর কথা শুনে সে ভাবে, বুড়ো তাহলে জেনে গেছে সব। কালকে রাজামশাইকে বললেই তার মুণ্ডুটা কাটা পড়বে ধড় থেকে। তাই তাড়াতাড়ি সে বুড়োর পায়ে পড়ে বলে, বাঁচান আমাকে। আর কখ্‌খনও করব না আমি চুরি।

বুড়ো বুঝতে পারে। তাই গম্ভীর ভাবে বলে, ঠিক।

ঠিক, ঠিক, ঠিক, এই তিনসত্যি কবছি। কাঁদতে কাঁদতে বলে সেই দাসী নিদ্রাণী।

তা কোথায় রেখেছো সে হার ?

বাড়ির এই পুব কোণায় গোবরের মধ্যে রেখেছি হারটা।

বেশ, যাও তুমি। কোনো ভয় নেই তোমার।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ো রাজাকে বলে, মহারাজ বাড়ির ওই পুব কোণায় যে রয়েছে গোবরের গাদা, ওর মধ্যেই আছে হারটা।

সত্যিই তাই। ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। সবাই তারিফ করতে থাকে বুড়োর ক্ষমতার। রাজাও বলেন, হ্যাঁ, এমন মানুষ যে আমার রাজ্যে আছে তা ভাবাই যায় না। হ্যাঁ, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

রাজা যায় বাগানে। সেখান থেকে একটা ফড়িং ধরে হাতের মুঠোয় রেখে বুড়োকে বলে, আচ্ছা, বলতো, আমার হাতের মুঠিতে কী আছে ?

বুড়ো এবার পড়ে ফাঁপড়ে। সে জানে, ঠিক ঠিক যদি বলতে

না পারে সে, তাহলে রাজা তাকে ছাড়বে না সহজে। প্রাণের ভয়ে বুড়ো তখন বিড়বিড় করে বলতে থাকে—

ছ্যাক ছ্যাকানি শব্দে পিঠের কথা কইলে
নদীর ধারে গিয়ে ঘোড়ার দেখা যে পাইলে
নিদ্রাণীকে ডেকে জানলে কোথায় আছে হার
ফড়িঙ্গার ব্যাটা তোমার মরণ এবার!

বুড়োর বাবার নাম ছিল ফড়িঙ্গা। তাই সেই মরা বাপকে ডাক দিল বুড়ো। রাজা কিন্তু ভাবল, তার হাতের মুঠোয় যে ফড়িং তার কথাই বলেছে বুড়ো এমন ছড়া কেটে। আর কোনো সন্দেহ নয়। বুড়ো সত্যিই বিরাট জ্যোতিষী। সেই কথাটা ভেবেই রাজা তাকে দিলেন অনেক টাকা কড়ি। এবার থেকে সেই টাকাতেই মনের সুখে দিন কাটায় বুড়ো-বুড়ি।

হীরের টুকরো ছেলে

ছেলে তো নয় হীরের টুকরো। হ্যাঁ, যে দেখে সেই বলে ওই কথা। যেমন সুন্দর তাকে দেখতে, তেমনি স্বভাব। আর লেখাপড়ার তো তুলনাই হয় না। অমন ছেলে গ্রামে কেন সারা দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

ছেলের মা, পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে সবাই ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আশ্চর্য, ছেলের বাবার মুখ থেকে ভুলেও শোনা যায় না একটা ভাল কথা। উল্টে ওরি মধ্যে ছেলের কোথায় কি ত্রুটি সে-কথাই জোর দিয়ে বলে ছেলের বাপ।

ছেলের বাবার ওই ভাব দেখে কষ্ট পায় তার বউ। ভেবে পায় না, আর কী হলে উঠবে তার স্বামীর মন। সবাই যখন ছেলের প্রশংসা করে তখন স্বামীর ওই ব্যবহারের কথা ভেবে গোপনে চোখের জল ফেলে ওই বুড়ি বউটি।

ছেলেটিরও মনে সেই একই ব্যথা। একদিনও বাবা একটা ভাল কথাও বলল না। সবাই এত প্রশংসা করে কিন্তু বাবা একদিনও ভুলে এতটুকু প্রশংসা করেনি। ছেলেটির মাঝে মাঝেই মনে হয় বাবা কি তাকে হিংসে করে? সবাই তাকে এত ভাল বলে এটা কি বাবা সহ্য করতে পারছে না, আর তাই এমন চুপচাপ। ছেলেটির মনের এই দুঃখটা একদিন দাঁড়িয়ে গেল রাগে। অত ভাল ছেলেও রাগের চোটে

একদিন ঠিকই করে ফেলে, কিছুতেই যখন বাবার মন ওঠে না তখন সে খুনই করে ফেলবে বাবাকে। মনে মনে সে বলে ওঠে, অমন বাবা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

সেটা ছিল পূর্ণিমার সন্ধ্যা। ছেলেটি সেদিন তার বাবাকে মেরে ফেলবে বলে একটা বর্শা নিয়ে বসে থাকে কলাতলায়।

একটু বাদেই ফেরে ছেলেটির বাবা। ছেলেকে ঘরে দেখতে না পেয়ে বাবা বলে, কি গো, তোমার ছেলেকে দেখছি না যে, সে গেল কোথায় ?

স্বামীর কথায় একটু অভিমানের সুরেই বলে বুড়ি, কেন তার খোঁজে আবার তোমার কি দরকার ? ছেলে তো তোমার ভাল নয়, তাকে তো তুমি মোটেই দেখতে পার না। তোমার বিচারে তো সে এমন খারাপ যে, তার সম্পর্কে একটি ভাল কথাও বলা যায় না।

বলতে বলতে বুড়ি প্রায় কেঁদে ফেলে। বাবা কিন্তু হেসে ওঠে প্রায় হো-হো করে। বলে, আচ্ছা, তুমি কি পাগল হলে ? না হলে আমাদের ছেলে সম্পর্কে ওসব কথা বলতে পারতে ? দেখ, ও এখন এখানে নেই তাই বলছি, ওই যে আকাশে দেখছ পূর্ণিমার চাঁদটা, ওর বরং কলঙ্ক আছে, আমাদের ছেলের তাও নেই।

তাহলে ?

তাহলে কেন আমি ওকে ভাল বলি না এই তো ? দেখ, সবাই ওকে ভাল বলে তা শুনে গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। তবু ভয় হয়, আমিও যদি ভাল বলতে থাকি তাহলে হয়তো ওর মধ্যে অহঙ্কার এসে যাবে। আর একবার যদি মনে অহঙ্কার আসে, তাহলে যে পতন অনিবার্য। তাই তো, তাই তো আমি ওকে মুখে কিছু বলি না। না হলে

ওর জন্য আমার হৃদয়ে যে ভালবাসা তা হয়তো বা তোমার চেয়েও বেশি, বুঝেছ বুড়ি !

দুজনে যখন ওইসব কথা বলছে, ছেলে তখন কলাতলা থেকে সবই শুনছে। বাবা তাকে কতটা ভালবাসে এবং তার ভালর জন্যই মুখে কিছু বলে না শুনে অনুতাপে তার মনটা যেন মরে যায়। এমন বাবাকে সে খুন করতে চেয়েছিল ভেবেই হু-হু করে কেঁদে ওঠে সে। একরকম ছুটতে ছুটতেই সে ঘরে ঢুকে তার বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে থাকে, আমাকে তুমি ক্ষমা কর বাবা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

তার ব্যাপার-স্যাপার দেখে বাবা মা দুজনেই হতবাক। তারা বুঝতে পারে না কেন কাঁদছে ছেলে, কিসের জন্য ক্ষমা চাইছে। বাবা তাকে পায়ের তলা থেকে তুলে নিয়ে বলে, কি ? হয়েছেটা কি ? কিসের জন্য তুই কাঁদছিস ?

ছেলে এবার আস্তে আস্তে সব কথাই বলে। বাবা হেসে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, পাগল ছেলে কোথাকার। যা নিজের কাজ কর্।

এবার যেন বুড়ো বুড়ির সংসার সত্যই ভরে উঠল আনন্দ। এবার তাদের চেয়ে সুখী মানুষ যে আর কেউ নেই পৃথিবীতে।

মোল্লার ভাঁওতা

এক ছিল মোল্লা। জ্ঞানগম্যি যাই থাক হাঁকডাক ছিল তার বেজায়। সবসময় এমন ভড়ং দেখাত যাতে মনে হত ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যই হয় তার নানা বিষয়ে কথাবার্তা। এই দুনিয়ায় হেন জিনিস নেই যার সম্পর্কে সে কিছু জানে না। আর আধ্যাত্মিক শক্তিতে তার-চেয়ে বড় সাধক যেন আর নেই—এমনই তার ভাব।

গাঁয়ের সোজা সরল বোকা মানুষগুলো মোল্লার এসব ভড়ং দেখে ভড়কে যায়। তারা রীতিমত ভয় করে মৌলবীকে আবার ভক্তিও করে। গাঁয়ের মানুষের এই ভয় আর ভক্তিই মোল্লার রোজগারের মূলধন। গাঁয়ের লোকেদের কাছ থেকে প্রতিদিনই সে যা আদায় করে তাতে তার নিজের তো বটেই সংসারেরও সব খরচ চলে যায় অনায়াসে। মোদ্দা কথা, না খেটে শুধু বুদ্ধির জোরে মোল্লার দিনগুলো কাটে বেশ সুখেই।

সেদিন গাঁয়ের একটি লোক মোল্লাকে নেমতন্ন করল দুপুরে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য। মৌলবি দারুণ খুশি। লোকটা গাঁয়ের মধ্যে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন। তাই খাওয়াটা জব্বর হবে ভেবে সকাল থেকেই মোল্লার জিব দিয়ে ঝরতে থাকে জল।

ভর দুপুরবেলায় গলায় মালা দিয়ে বেশ সেজেগুজেই মোল্লা পাড়ি দেয় সেই লোকটির বাড়ি।

মোল্লাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে লোকটি। খাতির করে নিয়ে যায় তাকে। মোল্লা কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে ওঠে হেই, হ্যাট্ হ্যাট্।

লোকটি ইতিউতি তাকায়, কিছুই দেখতে পায় না। অথচ তার সামনেই মোল্লা যেন কাকে তাড়িয়ে দিল তা ওই আওয়াজেই মালুম পেল লোকটি। মৌলবিকে ভয় পেলেও কৌতূহলের কাছে হার মানল সে। বেশ বিনয়ের সঙ্গেই সে বলে, আপনি হঠাৎ হ্যাট্ হ্যাট্ কবলেন কেন ?

মোল্লা বলে, না, ও কিছু নয়।

নিশ্চয় কিছু একটা হযেছে। আমাব বাডিতে কি অশুভ কিছু আছে ?

আবে না-না।

তবে !

তবে আবার কি ?

ওই যে আপনি হ্যাট্ হ্যাট্ করলেন।

না ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। হঠাৎ দেখলুম একটা কুকুর কাবা মসজিদে ঢুকতে যাচ্ছে তাই তাকে তাড়িয়ে দিলাম।

কথাটা শুনে তো লোকটি তাজ্জব। কোথায় আরবের মক্কা আব কোথায় এই অজ-গাঁ। এখান থেকে মোল্লা সব দেখতে পেল ? দারুণ ক্ষমতা তো তার ! ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে লোকটি। আপনি এখান থেকে দেখতে পেলেন ?

হ্যাঁ, কিছু কিছু দেখতে পাই। বলেই একদম চুপ হয়ে গেল মোল্লা। লোকটির মুখ দেখে বুঝল ওষুধটা বেশ ভাল পড়েছে। বেশ

কিছু আদায় করা যাবে এর কাছ থেকে। লোভে মোল্লার চোখ দু'টো চকচক করে ওঠে।

লোকটির বউ দূর থেকে শুনেছিল সবই। তার কিন্তু মনে হল সব ঢং। এখান থেকে কেউ দেখতে পায় নাকি মক্কার ঘটনা। আর যদি কেউ পায়ও তার চেহারা এমন হবে না। বউটির তাই মনে হয়, কেমন মোল্লা সে পরীক্ষা করে দেখবে একবার।

বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ বসে গল্পগুজব করে লোকটিকে আরো কাবু করে মৌলবি বসল খেতে। ভোজটা জব্বর হবে এই ভেবে চোখ তার জুলুজুলু। লোকটার বউ একটা বড় থালায় সুন্দর করে সাজিয়ে ছিল সাদা ধবধবে ভাত। চালের খুশবুতে চোখ বোজে মোল্লা। ভাবে ভাতই যখন এমন তখন গোস্ত তরকারি না জানি কী সুন্দরই হবে।

বউটি কিন্তু ভাতের থালা বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। আর নড়ে না। মোল্লা ভাবে, একি কাণ্ড, মাংস তরকারি আনছে না কেন! বউটি যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তাতে তো নড়বার লক্ষণটি নেই। ব্যাপারটা কি?

মোল্লার আনচান ভাব দেখে বউটি বলে, কী হল খাচ্ছেন না কেন, খাবার কী না-পসন্দ?

রাজ্যের বিরক্তি ঝরে পড়ে মোল্লার গলায়। বলে পছন্দ আর হবে কি করে?

কেন?

বলি শুধু শুধু ভাত কেউ খেতে পারে?

শুধু শুধু হবে কেন, সবই তো দিয়েছি।

এই তোমাদের সব, আমার সঙ্গে রসিকতা?

কী বলছেন, আপনার সঙ্গে রসিকতা! আমি তো মাছ মাংস তরকারি সবই দিয়েছি।

কোথায়? আমার চামড়ার চোখে তো আমি ভাত ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

সে কি! আপনি এখান থেকে মক্কার কাবা মসজিদে কুকুর ঢোকা দেখতে পান, আর সামান্য ভাতের নিচে ঢাকা মাংস তরকারি দেখতে পান না। এ তো বড় তাজ্জব।

বউটির কথায় ভাত ভাঙতেই মোল্লা দেখল, ভাতের তলায় বউটি লুকিয়ে রেখেছে মাছ মাংস তরকারির বাটি। লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে ওঠে তার। বুঝতে পারে বউটির কাছে ধরা পড়ে গেছে তার ভাঁওতাবাজি। তাই আর কোনো কথা না বলে চটপট খেয়েই সরে পড়ে সেখান থেকে।

বউটা হেসে বলে তার স্বামীকে, দেখলে তো তোমার মোল্লার ক্ষমতা। মক্কার কুকুর দেখে, কিন্তু আমি যে ভাতের নিচে সব দিয়ে রেখেছি তা ঠাহর করার ক্ষমতা নেই তার। এমন ভণ্ডর কথায় আর ভুলবে কোনো দিন?

লোকটি আর কি বলবে? শুধু মাথা চুলকোয় আর বলে, না-না-না—কখ্খনও না।

———